মঙ্গল পাণ্ডের বিচার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ কালীঘাট পট অবলম্বনে বিপুল গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

শ্রীসত্যব্রত দত্ত
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

এ-বইয়ের সব কয়টি রচনাই শারদীয়া অথবা বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি রচনাই ইতিহাসাশ্রিত। কিন্তু অ্যাকাডেমিক অর্থে যাকে বলে গবেষণা-কর্ম ঠিক তা নয়। সে-কারণেই বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী, পাদটীকা ইত্যাদি বাদ দেওয়া গেল। ব্যবহৃত পুথিপত্র সম্পর্কে কিছু আভাস রচনার মধ্যেই রয়েছে, কৌতূহলী পাঠকের জন্য আরও কিছু বইয়ের নাম দেওয়া হল।

'মঙ্গল পাণ্ডের বিচার' রচনাটির প্রধান উপজীব্য সামরিক আদালতে তাঁর বিচার। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ নিয়ে অসংখ্য বই রচিত হয়েছে। এখনও হচ্ছে। গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য : English Historical Writings on the Mutiny 1857-1859, S. B. Chaudhuri, Calcutta, 1979. অধিকাংশ বইয়েই কমবেশি মঙ্গল পাণ্ডের কথা আছে। আমি তাঁর বিস্তৃত কাহিনী পেয়েছিলাম আকস্মিকভাবে হাতে আসা একটি সরকারী দলিলে। নাম—Appendix to Papers relative to the Mutinies in the East India, Inclosures in Nos. 7 to 19, Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London, 1857.

'নীল আগুন' রচনার প্রতিপাদ্য বিখ্যাত নীল-বিদ্রোহ। এ-সম্পর্কেও বইপত্রের অভাব নেই। বিস্তৃত গ্রন্থতালিকা রয়েছে একাধিক বইয়ে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটির নাম : The Blue Mutiny, Blair B Kling, Philadelphia, 1966. তাছাড়া আরও

একটি বই আমার ভাল লেগেছিল : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ১৯৬০। আমি এ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম একটি চালু নীলকুঠির কতকগুলো আলোকচিত্র দেখে। আঁকা ছবি নয়, ক্যামেরায় তোলা জীবন্ত সব ছবি। তার কথা পরে।

'ফাঁসিবাজার' পুরানো বিষয় হয়েও একই সঙ্গে নতুন বিষয়। বিচারের নামে ফাঁসি দেশে দেশে এখনও অব্যাহত। সত্তরের দশকে কলকাতার দেওয়ালে একটি মেয়ের ফাঁসি রদ করার দাবি জানিয়ে সেঁটে রাখা একটি প্রাচীরপত্র দেখে আমি তাগিদ অনুভব করেছিলাম এ-বিষয়ে কিছু লেখার জন্য। তারই ফল এই রচনা। যেসব বই পড়ে উপকৃত হয়েছি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : Hanged by the Neck, Arthur Koestter and C. H. Ralph, London, 1961; Hanged in Error, Leslie, London, 1961; The Executioners, Robert Christophe, London, 1962; The Death Penalty, Amnesty International Report, London, 1979.

'অন্য ডাকাতরা' বলতে আমি একধরনের সামাজিক বিদ্রোহীদের কথাই বলতে চেয়েছি। এ সম্পর্কে চমৎকার দুটি বই : Primitive Rebels, E. J. Hobsbawm, London, 1959; Bandits, E. J. Hobsbawm, London, 1969. এছাড়া আরও একটি বই আমার কাজে লেগেছে : Patterns of Dacoity in India, A Case Study of Madhya Pradesh, Shyam Sunder Katre, New Delhi, 1972; সম্প্রতি প্রকাশিত আরও একটি বইয়ের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : Robin Hood, J. C. Holt, London, 1982.

চারটি রচনারই মূল কথা এক—প্রতিবাদ। নায়কেরা সবাই, যাকে বলে—বিদ্রোহী। দুই মলাটের মধ্যে একসঙ্গে এইসব রচনা, অতএব আশা করি পাঠকেরা মেনে নিতে আপত্তি করবেন না।

এবার ছবি প্রসঙ্গ।

'মঙ্গল পান্ডের বিচার'-এ ব্যবহৃত প্রথম ছবিখানা সমসাময়িক কালে ইংরাজ শিল্পীর আঁকা দিল্লির কাশ্মিরী গেট-এ যুদ্ধের দৃশ্য। সাতান্নর মহাবিদ্রোহ সংক্রান্ত একাধিক বইতে ছবিটি রয়েছে। দ্বিতীয় ছবিটি তখনকার বারাকপুরের রাজভবনের। নেওয়া হয়েছে British Government in India, The Story of the Viceroys and Government Houses, the Marquis Gurzon of Kedleston, Vol-I, London, 1925 থেকে।

নীলকুঠির আলোকচিত্রটি কলকাতার প্রাচীনতম ফটোগ্রাফির প্রতিষ্ঠান বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। ওঁদের কাছে সংরক্ষিত কিছু ছবি দেখেই আমি নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে নতুন করে উৎসাহিত

হয়েছিলাম। বোর্ণ অ্যাণ্ড শেফার্ড-এর বর্তমান সত্ত্বাধিকারী
শ্রী জে জে গান্ধী অনুগ্রহ করে আবার একপ্রস্থ ছবি তুলে দিয়েছিলেন
আমার হাতে। তার জন্য কৃতজ্ঞ। দুঃখিত মাত্র একখানা ছবি ব্যবহার
করতে পারা গেল বলে। অন্য ছবিটি কলসওয়ার্দি গ্রাণ্ট-এর আঁকা
নীল গাছ কাটার দৃশ্য। এটি নেওয়া হয়েছে যে বই থেকে তার নাম :
Rural Life in Bengal, London, 1866. এটি পাওয়া
গেছে বন্ধুবর রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সৌজন্যে। তাঁকেও
আন্তরিক ধন্যবাদ।

'ফাঁসিবাজার'-এর প্রথম ছবিটি ব্রিটেনে একটি পথের ধারের দৃশ্য।
ফাঁসির পর মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হত এখানে। এই সুন্দর
এবং ভয়াবহ ছবিটি তোলেন আনন্দবাজারের ভূতপূর্ব
প্রধান আলোকচিত্রী বীরেন্দ্রনাথ সিংহ। তাঁকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা
জানাচ্ছি। অন্য দুটি দলিলের একটি কলকাতা হাইকোর্ট এবং
অন্যটি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। একটিতে
রয়েছে ফাঁসি বাবদে খরচের রসিদ, অন্যটি মৃত্যু পরোয়ানা।

'অন্য ডাকাতরা' রচনায় ব্যবহৃত প্রথম ছবিটি পিণ্ডারি দস্যুর।
ব্রিটিশ লাইব্রেরির সৌজন্যে মুদ্রিত। রবিনহুড-এর ছবিটি আনুমানিক
১৭০০ সনের একটি কাঠখোদাই। হবসবাম-এর বই থেকে নেওয়া।

বইটির মলাট থেকে অঙ্গসজ্জা সব কিছুই পরিকল্পনা করেছেন
তরুণ বন্ধু বিপুল গুহ। তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।
মলাটের ছবিটি বাংলার একটি পুরানো পট অবলম্বনে আঁকা। তারও
বিষয় ছিল বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ।

মঙ্গল পাণ্ডের বিচার

—তুমি কি কোনও গোপন কথা প্রকাশ করতে চাও? তোমার কি কিছু বলার আছে?

—না।

—গত রবিবার তুমি কি স্বেচ্ছায় ওই কাজ করেছিলে, না অন্যদের নির্দেশে?

—আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি মৃত্যুই প্রত্যাশা করেছিলাম।

ফৌজী সাহেবরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালেন। দলে ওঁরা তিনজন। ফিল্ড অফিসার মেজর ডব্লিউ এ কুক, কোয়ার্টার মাস্টার এফ ই সামিয়ার এবং ব্রিগেডিয়ার সি গ্রাণ্ট। সামিয়ার দলের দোভাষী। হার ম্যাজেস্টির ৫৩ নম্বর রেজিমেণ্টের কোয়ার্টার গার্ডের একটি ঘর। ঘর না বলে গারদ বলাই ঠিক। দরজায় সশস্ত্র পাহারাদার। ওঁদের সামনে একজন ভারতীয় সিপাহি। এতক্ষণ সে একটি দড়ির খাটিয়ার এককোণে জড়সড় হয়ে পড়েছিল। সাহেবদের দেখে কোনও মতে উঠে দাঁড়িয়েছে। সাহেবরা একনজরে দেখে নিলেন যুবকটিকে। খুবই আহত সে। কাঁধে আর গলায় ব্যাণ্ডেজ। হাতে কড়া। ওরা তাকে বসতে বললেন। সান্ত্রীকে ইঙ্গিত করলেন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। তারপর শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই করা হয়েছে এই বন্দীকে নিয়ে। বিচার-সভা। সাক্ষীসাবুদ। সওয়াল জবাব। তবু ফৌজী আইনমাফিক সব কাজ এখনও

শেষ হয়নি। রায় কার্যকর হয়ে যাওয়ার আগে অপরাধীর শেষ জবানবন্দী শোনা দরকার। সেটা শুধু কেতা নয়, সমগ্র বাহিনীর পক্ষে জরুরীও বটে। কে জানে, শেষ মুহূর্তে বন্দী হয়তো ভেঙে পড়বে। গড়গড় করে বলে যাবে অন্যদের নাম। কারা কারা ষড়যন্ত্র করেছিল, কী ছিল তাদের মতলব সেসব গোপন খবর জানা যাবে।

সাহেবরা আশপাশে ঝোপঝাড় পিটাতে শুরু করলেন। আসল প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটু ভণিতা করে নেওয়া ভাল।

—তুমি কি বন্দুকে টোটা ভরেছিলে নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য?

—না। আমি অন্যের জীবন নিতে চেয়েছিলাম। বন্দীর সাফ উত্তর। স্পষ্টতই সে ক্লান্ত। হয়তো কিছুটা বিরক্তও। কিন্তু ভাষায় কোনও ইতস্তত করার ভান নেই।

—তুমি কি অ্যাডজুট্যানট সাহেবের জীবন নিতে চেয়েছিলে, না অন্য কাউকে সামনে পেলেও গুলি করতে?

—যিনিই আমার সামনে আসতেন তাঁকেই আমি গুলি করতাম। এবারও গলা কাঁপল না তার। গলায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা জড়তা নেই।

বন্দী পরের প্রশ্নের জন্যও যেন তৈরী। সাহেবরা একটু দম নিলেন। ওকে একটু জুড়োতে দেওয়া ভাল।

দু' এক মিনিটের বিরতি। তারপর আরও কিছু প্রশ্ন। একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার। কেননা, এই শেষ সুযোগ। মাঝখানে বড়জোর একটি দিন। তারপর সব শেষ। পাখি হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বই কি! কিন্তু বৃথাই। প্রতিবারই ওর এক উত্তর—আমার আর কিছু বলার নেই। নিরাশ সাহেবরা খসখস করে লিখে গেলেন তাঁদের প্রতিবেদন—আমরা বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেদিনের ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম। তাকে অভয় দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল গোপন কথা ফাঁস করে দিলে তার নিজের রেজিমেণ্ট এখন আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কোনও খবরই সে ফাঁস করল না। তার এক কথা—যা বলার সে তো প্রথমেই বলে দিয়েছি। আমার আর কিছু বলার নেই।

সাহেবরা কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকল সান্ত্রী। দরজায় আর একজন দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে আবার নিজের চারপায়টিতে শুয়ে পড়ল সে। চোখ তার খোলা। দৃষ্টি উদাসীন। যেন জেগে জেগেই কোনও স্বপ্ন দেখছে। কী ছিল তার সেই স্বপ্নে? গম ক্ষেত, আম গাছ, খড়ের ঘর। উত্তর প্রদেশের কোনও গ্রাম? বৃদ্ধ মা বাবা। তরুণী বউ। অথবা পাশের গাঁয়ের সে মেয়েটি যে তার বউ হতে পারে বলে শুনেছিল সে, তাকে? নাকি দাউ দাউ আগুন? ক্ষেত পুড়ছে। কুঁড়ে পুড়ছে। দালান পুড়ছে। শহর বন্দর ছাউনি সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা নাচছে। আরামে চোখ বুজল বন্দী।
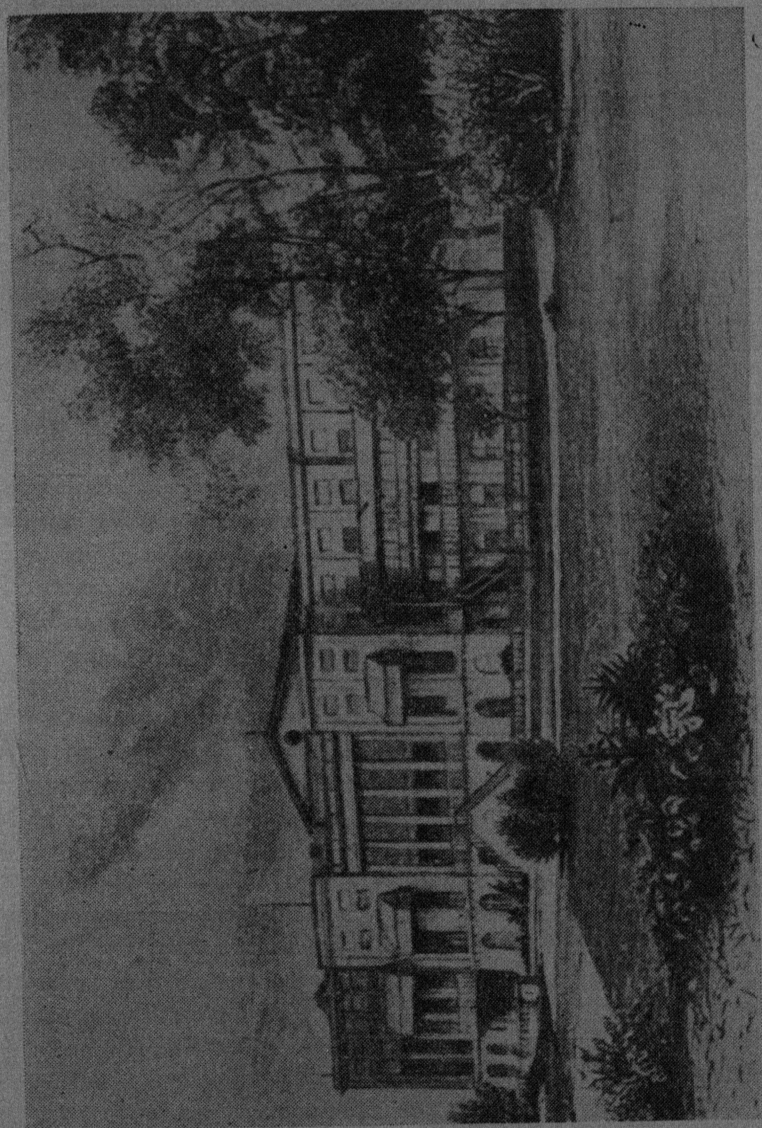
কোয়ার্টার গার্ডের ওই ঘরে হাতবাঁধা যে আহত যুবকটি ঘুমিয়ে আছে নাম তার—মঙ্গল পাণ্ডে। সে কোম্পানির ফৌজে সামান্য একজন সিপাহি। তবু ইতিহাসে সে অসামান্য পুরুষ। সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহের প্রতীক। আঠারশ' সাতান্নর ভারতীয় মহাবিদ্রোহে প্রথম গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তারই হাতের বন্দুক থেকে। বারুদের স্তূপে সে-ই প্রথম ছুঁড়ে দিয়েছিল জ্বলন্ত মশাল। তারপর আর কারও কোনও ভয় নেই। সবাই যেন লহমায় মঙ্গল পাণ্ডে। দিকে দিকে অগণিত পাণ্ডে। বাঙালী ঐতিহাসিকরা লিখতেন পাঁড়ে। মঙ্গল পাণ্ডে সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রথম। সে প্রথম পাণ্ডে। তারপরে যত বিদ্রোহী সবাই পাণ্ডে। ইংরাজ অভিধানকার লিখছেন—পাণ্ডে মানে ১৮৫৭-৫৮ সনে বিদ্রোহে যাঁরা বিদ্রোহী হয়েছিল তাঁরা। পাণ্ডে তাদের সাধারণ পরিচয়। বোর্সিয়ার নামে একজন ইংরাজ সেনাপতি লিখছেন—বারাকপুরে প্রথম যে দু'জনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা জাতে ছিল পাণ্ডে। সেই থেকে গোটা ভারতে সিপাহিদের নাম হয়ে গেছে পাণ্ডে। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। চার্লস বেল লিখছেন—"দি নেম হ্যাজ বিকাম এ রিকগনাইজড ডিসটিংশন ফর দি রেবেলিয়াস সিপয়স থ্রু আউট ইনডিয়া।" সাতান্নর মহাবিদ্রোহ নিয়ে রাশি রাশি বই লেখা হয়েছে এ পর্যন্ত। সেসব বইয়ের যত্রতত্র পাণ্ডে। অবশ্য বানান এক-একজনের এক-এক রকম। যাঁরা একটু বেশি জানেন তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডে এসেছে পণ্ডিত থেকে। তারা উচ্চবর্ণের হিন্দু। ব্রাহ্মণ। সাধারণত ওরা উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বাসিন্দা। সবাই এত খবর রাখেন না। রাখার দরকারও নেই। কর্নেল চিন্তিত। তিনি ভাবছেন—কে জানে, পাণ্ডেরা কী করে বসবে। মেমসাহেব উদভ্রান্ত—ওই বুঝি পাণ্ডেরা আসছে! আসছে বিদ্রোহী সিপাহিরা!

মঙ্গল পাণ্ডে তাদের পুরোভাগে। সে প্রথম বিদ্রোহী। সে প্রথম পাণ্ডে। হাজার হাজার সিপাহি তার নাম জানে। একশ' পঁচিশ বছর ধরে শত শত ঐতিহাসিকের কলমের মুখে উঁকি দিয়েছে এই নামটি। কিন্তু কেউ জানেন না খাটিয়ায় পড়ে থাকা ওই যুবকটির গাঁয়ের নাম। কাদের ছেলে সে? কোথায় ছিল তার ঘর? কেমন দেখতে ছিল সে তরুণ? সরকারী কাগজপত্র থেকে এটুকুই জানা যাচ্ছে মঙ্গল পাণ্ডে আর্মির একজন সিপাহির নাম। সে নেটিভ ইনফ্যানট্রির রেজিমেন্টের একজন সিপাই। তার কোম্পানি নম্বর ৫, রেজিমেন্ট নম্বর—৩৪, নিজের নম্বর—১৪৪৬। ব্যস, ওইটুকু। আরও একটা খবর আছে সরকারী দলিলে। ১৮৫৭ সনের ৬ এপ্রিল তার বয়স ছিল ২৬ বছর ২ মাস ৯ দিন।

ছাব্বিশ বছরের ওই হিন্দুস্থানী যুবার বুক কতখানি চওড়া ছিল তা অনুমান করতে হলে সেদিনের সিপাহিদের দিকে একবার তাকানো দরকার। সিপাই তখন বশ্যতার আর এক নাম। সতত সে নম্র ভদ্র বিনত এবং শৃঙ্খলা-পরায়ণ। কোম্পানি বাহাদুর অনেক কিছু দিয়েছে তাকে। এমনকি শিখেয়েছে স্বপ্ন দেখতেও।

ভারতে কোম্পানির বাহিনীর তখন তিনটি ভাগঃ বেঙ্গল আর্মি, মাদ্রাজ

আর্মি এবং বোম্বাই আর্মি। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের মুখে ফৌজে সব মিলিয়ে সৈন্য ছিল ৩ লক্ষ ১৪ হাজার। কামান—৫১৬টি। বাহিনীতে ইংরাজ সৈন্য ৫০ হাজার। তাদের মধ্যে ৪৫ হাজারই মোতায়েন উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তিন ভাগের মধ্যে সব চেয়ে বড় তখন বেঙ্গল আর্মি। পদাতিক অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার। মঙ্গল পাণ্ডে তাদেরই একজন।

বেঙ্গল আর্মির অধিকাংশ সৈন্যই উত্তরপ্রদেশের মানুষ। অযোধ্যা অঞ্চলের। কিছু বিহারের। ফৌজে তিনজনের মধ্যে দু'জনই ব্রাহ্মণ। কিংবা রাজপুত ক্ষত্রিয়। মূলত তারা চাষী পরিবারের সন্তান। কিন্তু অস্ত্রের ব্যবহার তাদের অজানা নয়। তবে ফৌজে যোগ দিয়েছে তারা লড়াইয়ের নেশায় নয়, কিছু নগদ রোজগারের আশায়। অনেকেই আসতে চায়। সুতরাং, বেছে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। সাহেবরা তাদেরই বাছতেন যাদের চেহারা এবং স্বাস্থ্য চমৎকার। একজন ইংরাজ সেনাপতি লিখেছেন—বেঙ্গল আর্মি সিপাইদের কাছে আমাদের ইংরাজ সৈন্যরা রীতিমত নিষ্প্রভ। হিন্দুস্তানীদের গড় উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির কম নয়। কেউ কেউ আরও লম্বা-চওড়া। মঙ্গল পাণ্ডেও হয়তো তাই ছিল। তবে উচ্চতা যাই থাক, সন্দেহ নেই, তার বুক ছিল চওড়া।

আগে আগে সিপাইরা সপরিবারে ক্যান্টনমেণ্টে বাস করতেন। মা বাবা বউ ছেলেপুলে সবাই তখন সিপাহির সঙ্গে থাকতেন। ক্যান্টনমেণ্টের একদিকে তাদের কুঁড়ের 'লাইন'। ওরা নিজেরাই নিজেদের ঘর তৈরি করিয়ে নিতেন। কোম্পানি কিছু আগাম দিত। পরে মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হত। মাদ্রাজ আর্মিতে সে-ব্যবস্থাই তখনও চালু। কিন্তু বেঙ্গল আর্মির রীতিনীতি পালটে গেছে। সিপাইরা এখনও নিজের কুটিরে বাস করে বটে, কিন্তু পরিবার পরিজন সঙ্গে থাকে না। খাটিয়া, উনুন, আর যৎসামান্য জিনিসপত্র নিযে তার একার সংসার। নিজেই সে নিজের খাবার বানায়। খাবার মানে চাপাটি। হয় গমের, না হয় বজরার। বজরা শস্তা। তাই বজরাই তাদের পছন্দ। সঙ্গে একটু ডাল। ব্যস। তাই খেয়ে সে তৃপ্ত। বাহিনীর কাজকর্ম সেরে জিমনাসিয়ামে ব্যায়াম করত, কেউ মুন্সীর কাছে চিঠি লেখাত। কেউ অন্যের কুটিরে চারপায়ে বসে আড্ডা দেয়। কেউ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়া শোনে। কেউ বা নেশাভাঙ করে। তবে ইংরাজ সৈন্যদের মতো মাতলামি করে না কেউ। দিশি সিপাইরা সাধারণত ভাঙ্ খায়। বয়স যাদের বেশি তাদের মধ্যে কারও কারও ঝোঁক আফিংয়ের দিকে। কিন্তু বাড়াবাড়ি দেখা যায় কদাচিৎ। সদাচারী হিসাবে বেঙ্গল আর্মির সিপাইদের খুবই নামডাক। বিশাল বাহিনী। কিন্তু শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয় ১৮২৫ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে বেঙ্গল আর্মিতে বিচারসভা বসাতে হয়েছে মাত্র ৩৫ বার। ১৬ বার উপলক্ষ ছিল দলত্যাগ। দলত্যাগ মানে নিজের বাহিনী ছেড়ে শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়া নয়, ফৌজ ছেড়ে গাঁয়ে পালিয়ে যাওয়া। অবাধ্য আচরণের জন্য বিচারসভা বসে ৩

বার, ১ বার বিনাকারণে অনুপস্থিত থাকার জন্য, এবং ১ বার ডিউটিতে ঘুমিয়ে থাকার জন্য। মাতলামি বা নেশাগ্রস্ত হয়ে বেসামাল আচরণের জন্য ওই বাহিনীতে কারও বিচার করতে হয়নি। মঙ্গল পান্ডের বিচারের সময় জজ-অ্যাডভোকেট প্রশ্ন করেছিলেন—আসমীকে কি বলে দেওয়া হয়েছে যে সে আগে কোনও অপরাধের জন্য সাজা পেয়ে থাকলে এবার সে-প্রসঙ্গও উঠবে। অন্যরা উত্তর দিয়েছিলেন—না, আগে সে কখনও কোন অপরাধ করেনি। পরের প্রশ্ন—তার স্বভাবচরিত্র কেমন ?—ভাল। সাক্ষ্য দিলেন ওপরওয়ালারা। তার শেষ জবানবন্দী নিতে গিয়েছিলেন যে তিন সাহেব তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কি সেদিন কোনও নেশা করেছিলে ?—হ্যাঁ। উত্তর দিয়েছিল মঙ্গল পান্ডে। অন্তত দলিলে তাই লেখা। সে নাকি বলেছিল—আগে আমি কখনও এসব জিনিস স্পর্শ করতাম না। ইদানীং ভাঙ আর আফিম খাচ্ছিলাম। আমি কী করছি আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। বলাই বাহুল্য, এই বাক্য দুটি আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। যাঁরা সেদিন প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ওসব একজন নেশাগ্রস্ত যুবকের কান্ড, তাঁরাও নিশ্চয় অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন সে অন্য ধরনের নেশা। নয়তো পলকে এই বিশাল দেশ আগুনের মতো এমনভাবে দাউ দাউ করে জলে উঠত না।

স্পষ্টতই অন্য নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল মঙ্গল পান্ডে। তা না হলে কেউ কি এমন করে নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ? সুখের চাকরি। মাস গেলে হাতে আসে নগদ সাত টাকা। যেকোনও ইংরাজ অবশ্য ফৌজে যোগ দেওয়া মাত্র তার তিনগুণ পায়। তাতে কিছু আসে যায় না। মঙ্গল পান্ডের মতো চাষী ঘরের ছেলের কাছে মাসে সাত টাকা অনেক টাকা। ১৮৩৪ সনে সিপাহিদের মাইনে একটাকা বাড়ানো হয়েছে। সাত নয়, মঙ্গল পান্ডের মাইনে অতএব আট টাকা। আট টাকা অবশ্য সে হাতে পায় না। এটা-সেটা বাবদ কোম্পানি প্রতি মাসেই কিছু না কিছু কেটে নেয়। যেমন—কাপড়চোপড়ের জন্য তাকে দিতে হয় বছরে পাঁচ টাকা। তাছাড়া রেজিমেন্টের রজক-পরামানিকের জন্যও কিছু দিতে হয়। মাসে কমপক্ষে ছ' আনা। সত্যি বলতে কী, কোনও সিপাই-ই মাস শেষে ছ' টাকার বেশি হাতে পায় না। তার মধ্যে প্রায় সবাই তিন টাকা দেশে পাঠিয়ে দেয়। বাকি তিন টাকা নিজের খরচ। যারা কিছু বেশি পাঠায় তারা দেড়-দু টাকায় কোনও মতে মাস চালিয়ে দেয়। দেশের বাড়িতে বিয়ে-শাদী বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে অবশ্য বিপদ। তখন চড়া হারে সুদ কবুল করে ধারদেনা করতে হয়। অনেক সিপাইকে ফৌজী জিনিসপত্রের মতো বইতে হয় নিয়মিত দেনার বোঝাও।

তবু ওরা খুশি। কারণ, প্রত্যেকেরই নাকের সামনে ঝুলছে লাল মুলো। মাঝে মাঝে ওরা লম্বা ছুটিতে দেশে যায়। তখনও পাঁচ টাকা করে মাইনে দেন সরকার। ষোল বছর ফৌজে থাকলে মাস মাহিনা আরও একটাকা বেড়ে যাবে। কুড়ি বছর পরে দু'টাকা। তারপর রয়েছে পেনসন। কুড়ি বছর চাকরি হয়ে গেলে সিপাই মাসে তিন টাকা পেনসনের অধিকারী ছিল। ১৮৩৬ সনে বেন্টিঙ্ক সেটা

বাড়িয়ে চার টাকা করেন, একই সঙ্গে পেনসন পাওয়ার যোগ্যতা ধার্য করা হয় কুড়ি থেকে কমিয়ে পনের বছর চাকুরি। মঙ্গল পাণ্ডের অবশ্য তখনও পনের বছর চাকরি হয়নি। সরকারী খাতাপত্র বলছে ১৮৫৭'র ৬ এপ্রিল তারিখে তার চাকরি হয়েছে ৭ বছর ২ মাস ৯ দিন। তা হোক। সাত একদিন পনেরতে পৌঁছাতে পারত। তাছাড়া পদোন্নতির সম্ভাবনাও ছিল। যারা কিছু পড়ালেখা জানে এবং যারা ঠিক মত কাজ করে তাদের সামনে রয়েছে স্বর্গের সিঁড়ি। কুড়ি বছর পর সে হাবিলদার হতে পারে। মাইনে তখন কুড়ি টাকা। চল্লিশ বছর টানা কাজ করে যেতে পারলে সুবাদার বনে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাইনে তখন আরও বেশি। প্রতি মাসে হাতে আসবে তখন কমপক্ষে চল্লিশ টাকা। সিপাহি থেকে সুবাদার হয়েছিলেন জনৈক সীতারাম। তাঁর 'আত্মকথা' ফৌজে থাকার নানা সুখকর স্মৃতিতে বোঝাই। তিনি সুবাদার হয়েছিলেন আটচল্লিশ বছর চাকরি করার পর। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। তবু সে কী আনন্দের অনুভূতি!

ধরে নেওয়া গেল আরও অগণিত সিপাহির মতো বৃদ্ধ মঙ্গল পাণ্ডেও সিপাহি হিসাবেই ঘরে ফিরে আসত একদিন। তবু কোম্পানির কৃপায় গ্রামের আর পাঁচজন বৃদ্ধের চেয়ে সে কি তখন অনেক বেশি সম্পন্ন, অনেক বেশি নিশ্চিন্ত নয়? তার পেনসনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যুদ্ধে মারা গেলে সে পেনসন ভোগ করত তার ওয়ারিশ। এমন সুখের চাকরি আর কে দিতে পারে ওদের।

কিছু কিছু ঝামেলা অবশ্য ছিল। সীতারাম লিখেছেন—এক ঝামেলা পোশাক নিয়ে। মোটা বিলাতি সুতি কাপড়ের পাতলুন। মোটা কাপড়ের লাল কোর্তা। সামনের দিকে অবশ্য খোলা যায়। কিন্তু বড্ড আটোসাঁটো। কাপড় মোটে নরম হতে চায় না। হাতের দিকে চেপে ধরে। তার ওপর কড়া বেলট। মাথায় হ্যাট। টুপিটা অবশ্য ভাল লাগত ওঁর। বেশ চালাক চতুর দেখায়। কিন্তু পোশাকটি দুঃসহ। ওরা যখন প্যারেড করছে না, কিংবা কোনও ডিউটি তখন প্রায় সবাই নিজেদের দিশি পোশাক পরত। ধুতি আর ঢিলেঢালা কোর্তা। কিংবা পাজামা আর পাঞ্জাবি।

মার্চ করার সময় পোশাকের মতো দুঃসহ ঠেকে পিঠের বোঝাটিও। ডোরা-কাটা সতরঞ্চিতে বাঁধা সিপাহির পিঠের গন্ধমাদনে থাকে তার লোটা কম্বল থালা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তাছাড়া ওজনদার এবং ৬০ রাউন্ড টোটা। সব মিলিয়ে রীতিমত এক বোঝা। সিপাইয়ের মনে তবু কোনও খেদ নেই। সাহেব-লোগ খাটিয়ে যেমন নেয়, তেমনই খাতিরও করে। মার্চ করলে মাসে দেড় টাকা বাড়তি রোজগার। ওটা ভাতা। তাছাড়া দেশ দেখা, সেও কম কী!

কোম্পানির বাহিনীগুলো অতএব বড় পরিবার হলেও সুখী পরিবার। তার তলায় রয়েছে সুখী সিপাহির মজবুত ভিত। হামেশাই দেখা যায় বিহার উত্তর প্রদেশের বিশাল জওয়ান উর্দি পরেই কর্নেলের বাংলোর বারান্দায় তাঁর ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিশুর মতো খেলছে। ঘোড়া ঘোড়া খেলা। সিপাই

ঘোড়া। সাহেবের বাচ্চারা সওয়ার। এই সিপাইকেই দেখা যায় দূরের কোনও ক্যাম্পে নিঃসঙ্গ অসুস্থ কোনও ইংরাজ অফিসারের শয্যার পাশে। মায়ের মতো আন্তরিকতায় সিপাই তাঁর সেবাশুশ্রূষা করছে। অন্যত্র তাকে সঙ্গে নিয়েই একাকিনী কোনও মেম সাহেব হয়তো বেরিয়ে পড়েছেন কোনও দূর দুর্গম পথে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ওঁরা জেনেছেন বাংলোর গেটে কোনও ভারতীয় সিপাহি যখন পাহারা দেয় সাহেব এবং মেমসাহেব তখন নির্ভাবনায় নিজেদের ঘরে ঘুমোতে পারেন। সিপাহি যখন ভ্রমণ-সঙ্গী, অচেনা দেশের অজানা পথে নিশ্চিন্ত তখন মেজর কিংবা সাব অলটার্নের বিবি।

তারই মধ্যে অবিশ্বাস্য দৃশ্য। উপরওয়ালা সাহেবের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে নিশানা করছে ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেণ্টের ৫ নম্বর কোম্পানির ১৪৪৬ নম্বর সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে। এই সেদিন পর্যন্তও যে ছিল বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি, সহসা সে পরিণত বিশ্বাসঘাতকে। এ-দৃশ্য ভাবা যায় না। ১৪৪৬ নম্বর সিপাহী যেন ভূতে-পাওয়া মানুষ।

আদালতের সদস্যরা দল বেঁধে ৪৩ নম্বর রেজিমেণ্টের সার্জেণ্ট মেজর হিউসন সাহেবের বাংলোয় গিয়ে হাজির হলেন। হিউসন অসুস্থ। শয্যাগত। তিনি শপথ নিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—২৯ তারিখে কী ঘটেছিল?

হিউসন ধীরে ধীরে বলে গেলেন সেদিনের কাহিনী।

ঘটনাটা ঘটে বিকেল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে। ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির কোয়ার্টার গার্ডের নায়েক ইমান খান আমার বাংলোয় এসে খবর দিল টোটা ভরা বন্দুক নিয়ে ৫ নম্বরের মঙ্গল পাণ্ডে কোয়ার্টার গার্ডের সামনে পাগলের মত পায়চারি করছে। সে বলল মঙ্গল পাণ্ডে ভাং খেয়েছে। ভাং খেলে নেশা হয়। আমি নায়েককে বললাম রেজিমেণ্টের অ্যাডজুট্যাণ্টকে খবরটা দিতে। তারপর ইউনিফর্ম চাপিয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে তলোয়ারটিও নিয়ে নিলাম। গিয়ে দেখলাম সেখানে মূর্তিমান শমনের মতো দাঁড়িয়ে মঙ্গল পাণ্ডে। তার গায়ে ফৌজি উর্দি। এমন কি বেলটও রয়েছে। কিন্তু পরনে প্যাণ্টলুনের বদলে ধুতি। সে আমাকে দেখে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। তাক করল। ঘোড়া টিপল। গুলিটা অবশ্য আমাকে আঘাত করল না। আমি তখন ছুটে অন্য দিকে সরে গেলাম। যেতে যেতে সিপাহিদের হুকুম দিলাম সার বেঁধে দাঁড়াতে। কোয়ার্টার গার্ডে তখন বেশ লোকজন। কারও গায়ে উর্দি আছে, কারও নেই। আমি গার্ডের ভারপ্রাপ্ত নেটিভ অফিসার জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি লোকটিকে গ্রেপ্তার করছ না কেন? সে জবাব দিল—আমি কী করতে পারি? আমার নায়েক গেছে অ্যাডজুট্যাণ্টের কাছে, হাবিলদার ফিল্ড অফিসারের বাংলোয়, আমি কি নিজে তাকে গ্রেপ্তার করব নাকি? আমি তাকে বললাম লোকজন ডেকে

বন্দুকে টোটা ভরে তৈরী হয়ে নিতে। তাই শুনে কিছু লোক গজগজ করতে লাগল। জমাদার তাদের জোর দিয়ে কিছুই বলল না। আমি তখন কোয়ার্টার গার্ডের ডাইনে এবং বাঁয়ে দু'জন সান্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে দিলাম মঙ্গল পাণ্ডের ওপর নজর রাখার জন্য।

হিউসন বলে চললেন—৫ নম্বর কোম্পানির জমাদার গণেশ লালা এবং হাবিলদার মাকলার প্রসাদ মঙ্গল পাণ্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। ওরা কথা বলছিল হিন্দুস্তানীতে। আমি সব কথা বুঝতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝেছিলাম মঙ্গল পাণ্ডেকে তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু কাজ কিছু হল না। পরক্ষণেই আমি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। অ্যাডজুট্যাণ্ট লেঃ বগ এসে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। অ্যাডজুট্যাণ্ট চেঁচিয়ে বললেন—কোথায় সে? আমি হাঁক দিয়ে বললাম—আপনার বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখুন। পরক্ষণেই বলে উঠলাম—প্রাণে বাঁচতে চান তো ডাইনে সরে যান। সিপাই আপনাকে গুলি করবে। তাই হল। মঙ্গল পাণ্ডে বন্দুক নিশানা করে গুলি চালাল। অ্যাডজুট্যাণ্টের ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লেঃ বগ কোনও মতে নিজেকে ঘোড়া থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পিস্তল টেনে নিয়ে গুলি ছুঁড়লেন। আমি দেখলাম গুলিটা ঠিক মত হল না। অ্যাডজুট্যাণ্ট তখন তলোয়ার বার করে মঙ্গল পাণ্ডের দিকে ছুটলেন। তাঁকে দেখে আমিও তলোয়ার হাতে পিছু নিলাম। অন্য সিপাইদের বললাম বন্দুকে টোটা ভরে তৈরী থাকতে।

দু'জনে একসঙ্গে তার মুখোমুখি। মঙ্গল পাণ্ডেও খাপ থেকে তলোয়ার বের করল। (ইংলিশ সোর্ড নয়, দিশি তলোয়ার)। প্রথমেই আঘাত হানল আমাকে। আঘাতটা আমার লাগল না, লাগল অ্যাডজুট্যাণ্টের। আবার সে আঘাত করল আমাকে। একই সঙ্গে পেছন থেকে কেনও সিপাই বন্দুকের কুঁদ দিয়ে আমাকে আঘাত হানল। লোকটি কে, আমি ঠিক চিনতে পারিনি। তবে তার গায়ে সামরিক পোশাক ছিল। মাটি থেকে উঠে আবার আমি এগিয়ে গেলাম মঙ্গল পাণ্ডের দিকে। বাঁ হাতে তার কোটের কলার চেপে ধরলাম। ডান হাতে আমি তলোযার দিয়ে তাকে দু' এক ঘা বসিয়ে দিলাম। সেও আমাকে আঘাত হানল। এবারও পেছন থেকে কে আমার পিঠে এবং মাথায় আঘাত করছে। আমি আবার মাটিতে পড়ে গেলাম। কোনও মতে খাড়া হয়ে দেখলাম কোয়ার্টার গার্ডের সামনে বেশ কিছু সিপাই সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দেখলাম লেঃ বগ টলতে টলতে কোনও মতে ৪৩ নম্বর বাহিনীর লাইনের দিকে চলেছেন। তাঁর জ্যাকেট রক্তে ছয়লাপ। আমিও তাঁর পিছু পিছু চললাম। আমার বাংলোর কাছে এসে মনে হল পেছনে যেন কারও পায়ের শব্দ। পেছন ফিরে দেখি জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে। আমি তাকে বললাম—তুমি নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করেছ। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব। আমি ওর তলোয়ারটা ধরে ফেলার চেষ্টা করলাম। ঈশ্বরী পাণ্ডে চট করে পিছিয়ে গেল। এদিকে আমার স্ত্রী এবং কন্যা এগিয়ে এসেছেন। কন্যা

মানে আমার স্টেপ-ডটার। ওঁরা ধরাধরি করে আমাকে সার্জেণ্ট-মেজরের বাংলোয় নিয়ে গেলেন। সেখানে লেঃ বগও হাজির। তাঁর হাতে গভীর ক্ষত।

—কোয়ার্টার গার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মঙ্গল পাণ্ডে কি কিছু বলছিল? আদালতের প্রশ্ন।

—নিকালো পলটন, নিকালো হামারা সাথ। উত্তর দিলেন হিউসন। বলছিল—তোমরা আমাকে সামনে ঠেলে দিলে, নিজেরা এখন এগিয়ে আসছ না কেন? তারপর আরও প্রশ্নোত্তর।

—সিপাই যখন আপনার দিকে গুলি ছোঁড়ে তখন কি আপনার মনে হয়েছিল যে গুলিটা পাশ দিয়ে চলে গেল, অথবা কোন কিছুতে লাগল?

—আমি খুব কাছাকাছিই বুলেটের আওয়াজ পেয়েছিলাম।

—লেঃ বগ আর আপনি যখন এগিয়ে গেলেন তখন কি পেছনে কোনও গুলির আওয়াজ পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। আওয়াজটা আসছিল সিপাইদের আস্তানার দিক থেকে। কাছাকাছি আওয়াজ। আমার মনে হয় গুলিটা আমাদের দু'জনের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—ঘটনাটা কোয়ার্টার গার্ড থেকে কত দূরে ঘটে?

—তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে।

—আপনারা যেখানে ছিলেন সেখানে কত লোক ছিল?

—আমি যেখানে পড়ে গিয়েছিলাম সেখানে কমপক্ষে সাত আটজন লোক ছিল। তাদের গায়ে ফৌজী পোশাক ছিল। আমার মনে হয় তারা কোয়ার্টার গার্ডের লোক।

—কেন মনে হয়?

—কারণ কোয়ার্টার গার্ডের লোকেরা উর্দি-পরা ছিল। অন্যদের পক্ষে এত চটপট পোশাক পরে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোয়ার্টার গার্ডের সিপাইদের পাতলুন সাদা, পিকেট-এ যারা থাকে তাদের পাতলুন নীল। আমি একজনকে চিনেও ফেলেছিলাম। তার নাম—হীরালাল তেওয়ারি। সে আমাকে আঘাত করছিল। তেওয়ারি কোয়ার্টার গার্ডের লোক।

—আপনি কি দেখেছিলেন যে রেজিমেণ্টের লোকেরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে তাকিয়ে আছে?

—হ্যাঁ। অনেক লোক ছিল সেখানে।

—কেউ কি সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল?

—আমি কাউকে দেখিনি। আমার চোখ ছিল মঙ্গল পাণ্ডের দিকে।

—কোয়ার্টার গার্ডের জমাদার কিংবা অন্যরা কি আপনাকে কিছু বলছিল?

—না। ওরা কথা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

—আপনার শরীরে তলোয়ারের ক'টা আঘাত লেগেছে?

—দুটো। মাথায়।

এই প্রশ্নোত্তরের পালা যখন চলছে তখন অপরাধী নিজেও সেখানে হাজির। আদালতের তরফে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে সাক্ষীকে জেরা করবে কি না। মঙ্গল পাণ্ডে জবাব দিল—না। তার ইচ্ছে নেই।

আদালতের সদস্যরা এবার চললেন লেঃ হেনরি বগ-এর বাংলোর দিকে।

প্রশ্ন: ২৯ মার্চের ঘটনা কি একটু বলবেন?

লেঃ বগ তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন:

গত রবিবার, বেলা তখন বিকাল ৫টা হবে, রেজিমেণ্টের হাবিলদার মেজর আমার বাড়ি এসে খবর দিল ৫ নম্বর কোম্পানির একজন সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে বেরিয়ে এসে কোয়ার্টার গার্ডের সামনে সার্জেণ্ট মেজরকে গুলি করেছে। আমি তাকে বললাম কর্নেল হুইলারকে ঘটনা জানাতে। তারপর হুকুম দিলাম আমার ঘোড়া নিয়ে আসতে। ইউনিফর্ম পরে পিস্তল নিয়ে তৈরী হয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম। জোর কদমে ছুটে গেলাম কোয়ার্টার গার্ডের সামনে। আমি ঘটনাস্থলে পেঁছাতে না-পেঁছাতে গুলি। আমার ঘোড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি কোনও মতে ঘোড়া থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিস্তলটি টেনে নিলাম। দেখলাম সে আবার বন্দুকে টোটা ভরছে। আমি তৎক্ষণাৎ গুলি চালালাম। সে বন্দুকে গুলি ভরার চেষ্টা ছেড়ে দিল। আমি তাকে ধরার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে তার দিকে ছুটে গেলাম। কাছাকাছি পেঁছাবার আগে সেও তার কোমর থেকে তলোয়ার টেনে নিল। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম ঘোড়াটা ঠিক কোথায়, আর একটা পিস্তল বের করে আনতে পারলে ভাল হত। কিন্তু ঘোড়া ততক্ষণে ওখান থেকে সরে গেছে। আমি তলোয়ার দিয়েই ওকে আক্রমণ করলাম। পাঁচ থেকে আট মিনিট চলেছিল আমাদের তলোয়ারের লড়াই। ওর তলোয়ারের একটা আঘাত আমার বাঁ হাতটাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে দিল। তাছাড়া ঘাড়েও জোর কোপ পড়েছে। একটা আঘাত এসে পড়ল মাথায়। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ওটা তলোয়ারের আঘাত, না বন্দুকের বাটের। তারই মধ্যে কাছাকাছি থেকে কেউ গুলি চালাল। গুলিটা এসেছিল কোয়ার্টার গার্ডের দিক থেকে। আমার মনে হল আমাকে যেন ঘিরে ফেলা হচ্ছে। আমি পিছু হটতে আরম্ভ করলাম। তখন শেখ পলটু ছাড়া কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। সে গ্রানেডিয়ার কোম্পানির সিপাই। শেখ পলটু কয়েদিকে ধরে ফেলায় আমার পালানোর কাজটা সহজ হয়ে গেল। আমি কোনও মতে ৪৩ নম্বরের সার্জেণ্ট মেজরের বাংলোয় পেঁছালাম। ক্যাপ্টেন উইগিনসও তখন সেখানে। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ডাঃ অ্যালেনের কাছে। ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করা দরকার।

তারপর টুকিটাকি আরও কিছু প্রশ্ন। ঘটনাস্থলটি ঠিক কোথায়, সেখানে আরও লোক ছিল কি না, তলোয়ারের লড়াইয়ের সময় মঙ্গল পাণ্ডে তাঁকে কিছু বলছিল কি না—ইত্যাদি। বগ বললেন—মঙ্গল পাণ্ডে তাঁকে লড়াই করতে করতে

কিছু বলেছিল কি না তাঁর মনে নেই। মঙ্গল পাণ্ডে এবারও চুপচাপ শুনে গেল সব। না, তার কোনও বক্তব্য নেই।

আদালতের সদস্যরা আবার ফিরে গেলেন ৩৪ নম্বর রেজিমেণ্টের মেস-হাউসের দিকে। এবার ডাক পড়ল ড্রামবাদক জন লুইসকে।

—তুমি কি ২৯ মার্চ রবিবার বিউগলার হিসাবে কোয়ার্টার গার্ডে হাজির ছিলে?

—হ্যাঁ। আমি কোয়ার্টার গার্ডের ড্রামার।

—সেদিন বিকালে তুমি কী দেখেছিলে?

—চারটের পর কয়েদি বেরিয়ে এসে হাঁক দিল, বিউগলার কোথায়? আমাকে দেখতে পেয়ে বলল—বাজাও। বাজিয়ে সবাইকে ডাকো।

—আমি তার হুকুম মতো বাজালাম না। ভয়ে। সে আমার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। আমি তবু তার হুকুম মানতে নারাজ। এমন সময় একজন সিপাইকে দেখে সে বন্দুক নামাল। তাকে বলল—তোমরা তৈরী হচ্ছ না কেন? আমরা এসব করছি আমাদের ধর্মের জন্য। সে কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। বেশ কয়েকবার কথাটা বলল। সার্জেণ্ট মেজর যখন এলেন আমি দেখলাম সে তাঁকে গুলি করল। তিনি আসছিলেন বাঁ দিক থেকে। গুলিটা ঠিক কোথায় গিয়ে লেগেছে আমি জানি না। সিকি ঘড়ি পরে অ্যাডজুট্যাণ্ট এলেন। তিনিও এলেন বাঁ দিক থেকে। আমি দেখলাম লোকটি অ্যাডজুট্যাণ্টকে তাক করে গুলি চালাল। গুলিটা লাগল ওঁর ঘোড়ার পায়ে। ঘোড়াটা পড়ে গেল। অ্যাডজুট্যাণ্ট কোনও মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটেই গেলেন সিপাহিটির দিকে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সার্জেণ্ট মেজরও এগিয়ে গেলেন। সিপাই আবার গুলি চালাল। আমি দেখলাম সে তলোয়ার দিয়েও সার্জেণ্ট মেজর এবং অ্যাডজুট্যাণ্টকে আঘাত হানছে।

—তখন গার্ডের জমাদার কী করছিল?

—জমাদার পেছনের দিকে চলে গেল।

জমাদারের কথা বলতে গিয়ে ড্রামার ভয়ে নীল হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কথা বের হতে চাইছে না। আদালত তাকে আশ্বাস দিল ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। সে নির্ভয়ে সব বলতে পারে। নতুন করে আবার প্রশ্ন করা হল তাকেঃ

—যখন লড়াই চলছিল তখন জমাদার কী করছিল?

—সে তার লোকজন নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিছুই করেনি।

—আর তুমি? তুমি কি ওঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলে?

—না।

সত্য কথা বলল ড্রামার। তার সাহস ছিল না। ড্রামারের পর ডাক পড়ল হাবিলদার শেখ পলটুর। ২৯ মার্চের ঐতিহাসিক নাটকে মঙ্গল পাণ্ডে যদি এক ভূমিকায় পলটু তবে আর এক ভূমিকায়। আদালতের সদস্যরা চালাক চতুর

লোকটিকে এক নজর ভাল করে দেখে নিলেন। পলটু ৩৪ নম্বর রেজিমেণ্টের লোক। অর্থাৎ মঙ্গল পাণ্ডের বাহিনীর। সেও ছিল সিপাই। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যেই কপাল ফিরে গেছে তার। আদালত তাকে মনে করিয়ে দিল—শেখ পলটু, আগে তুমি গ্রেনেডিয়ার কোম্পানির সিপাই ছিলে, এখন হাবিলদার হয়েছ, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—২৯ তারিখে তুমি কী দেখেছিলে তাই বল।

—তখন বেলা ৩টা হবে। আমি টাটিতে গিয়েছিলাম। লাইনে ফিরে এসে দেখি সামনে মঙ্গল পাণ্ডে। তার গায়ে কোট, মাথায় টুপি. হাতে বন্দুক। সে চিৎকার করে বলছে..., (পলটু এখানে এমন একটি গালাগালি মঙ্গল পাণ্ডের মুখে বসিয়ে দিয়েছিল যা ছাপা যায় না।) সবাই বেরিয়ে আয়। ইউরোপিয়ানরা এসে গেছে। তৈরী হয়ে বেরিয়ে আয় সবাই। সে নিজে বেরিয়ে এল। সামনে পড়ল বিউগলার। তাকে বলল—বিউগল বাজিয়ে সবাইকে ডাকতে। ড্রামার দু'জন কাণ্ড দেখে লুকিয়ে পড়ল। সার্জেণ্ট মেজর এলেন। সিপাই তাঁকে গুলি করল। সার্জেণ্ট মেজর কোয়ার্টার গার্ডের সিপাইকে বললেন—দেখ, সিপাই আমাকে গুলি করল অথচ তুমি কিছুই করলে না। এদিকে কোয়ার্টার গার্ডের সামনে মঙ্গল পাণ্ডে একবার এদিকে যাচ্ছে, আর একবার ওদিকে।

—তুমি কি অ্যাডজুট্যাণ্টকে আসতে দেখেছিলে?

—হ্যাঁ।

—তখন কী হল?

—সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর ঘোড়ার বাঁ উরুতে গুলি করল।

—সে কি তাঁকে নিশানা করেছিল?

—হ্যাঁ।

—তারপর!

—ঘোড়া পড়ে গেল। অ্যাডজুট্যাণ্ট কোনও মতে ঘোড়া থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাতে পিস্তল তুলে নিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন—শেখ পলটু। কেউ আমাকে সাহায্য করছে না, তুমি আমার সঙ্গে এসো তো একবার। আমরা তখন এগিয়ে গেলাম। সার্জেণ্ট মেজরও সঙ্গে চললেন। সিপাইয়ের কাছে যাওয়া মাত্র সে অ্যাডজুট্যাণ্টকে তলোয়ারের ঘা বসিয়ে দিল। তাঁর হাতে আঘাত লাগল। সার্জেণ্ট মেজরকেও আঘাত করল সে। মাথায়। আবার আঘাত হানল সিপাই। আমি ছুটে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। সে আমার হাতও জখম করে দিল। উর্দিপরা সিপাইরা বন্দুকের বাট দিয়ে (অ্যাডজুট্যাণ্টকে) মারতে লাগল। সার্জেণ্ট মেজরকেও। তিনি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন।

—কোন সিপাইরা ওখানে ছিল?
—কোয়ার্টার গার্ডের সিপাহিরা। তাদের পরনে উর্দি ছিল।
—তুমি কি তাদের চেন?
—না। আমি কুড়ি পা দূরে ছিলাম। অ্যাডজুট্যান্ট যখন পালাচ্ছিলেন তখনই ওরা তাঁকে মারছিল।
—উর্দি-পরা ক'জন সিপাই ছিল সেখানে?
—আমি চারজনকে দেখেছিলাম।...
—সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে কি খুব উত্তেজিত ছিল?
—সে ভাং খায়। তবে সেদিন খেয়েছিল কিনা আমি জানি না।
—অ্যাডজুট্যান্ট এবং সার্জেন্ট-মেজর যখন চলে গেলেন তখন পাণ্ডের কী হল?
—ওঁরা চলে না-যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকে ধরেই রাখলাম। জমাদার তখন তিরিশ পা দূরে। আমি চেঁচিয়ে তাকে বললাম চারজন সিপাই পাঠিয়ে ওকে আটক করতে।
—জমাদার কি সিপাই পাঠিয়েছিল?
—না।

বিচার চলছে। বিদ্রোহী সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডের বিচার। স্থান—বারাকপুর। কাল—১৮৫৭। তারিখ ৬ এপ্রিল, সোমবার। বারাকপুর প্রাচীন জনপদ। এক সময় তার নাম ছিল—চানক। কেউ কেউ মনে করেন জোব চার্নকের পদচিহ্ন পড়েছিল গঙ্গার তীরে এই মনোরম বিন্দুটিতেও। সেটা ভুল। চানক নামে গ্রাম আরও আছে বাংলায়। সুকুমার সেন মনে করেন চানক অর্থে জাগ্রত গ্রাম। যে গ্রাম জেগে আছে। মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুকের আওয়াজেই ঘুম ভেঙেছিল বারাকপুরের? হয়তো। কিন্তু বারাকপুর কোনও দিনই ঘুমন্তপুরী নয়। এখানে কোম্পানির ফৌজ প্রথম আড্ডা গাড়ে ১৭৭২ সনে। চানক তখন থেকেই বারাকপুর। দেখতে দেখতে বারাকের গা ঘেঁসে উঁকি দিল ইউরোপিয়ানদের কিছু বাংলো। বারাকপুর লোভনীয় জায়গা। নদী, গাছপালা, শান্ত শীতল আবহাওয়া, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকেই নিজের জন্য একটি বড়সড়ো তৈরী বাংলো কিনে নিয়েছিলেন একজন প্রধান সেনাপতি। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সেটি দখল করে নেন ১৮০১ সনে। শৌখিন ওয়েলেসলির চোখেও বারাকপুর লোভনীয় জায়গা। কলকাতার রাজভবন থেকে তার দূরত্ব মোটে পনের মাইল। নদীতে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে অনায়াসে সেখানে পেঁছানো যায়। তাছাড়া একটা সড়কও রয়েছে। কমান্ডার ইন চিফ প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু ওয়েলেসলি ক্যাপ্টেন জেনারেল এবং সি-ইন-সি শিরোপা পাওয়ার পর তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তিনি বারাকপুর দখল করে নিলেন। বারাকপুর তাঁর নেশা।

উত্তরে বারাক বা ক্যান্টনমেন্ট। দক্ষিণে ১০০৬ বিঘা জুড়ে বিশাল

পার্ক। তার পরেই বহমান গঙ্গা। পার্ক আর ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ঝিল। এপার ওপার যোগ করেছে বাহারি সেতু। ওয়েলেসলি মনের মতো করে বাগান সাজালেন। ফুলবাগান, ফল বাগিচা, ছায়াবীথি। ওয়েলেসলির ইচ্ছা এখানে কলকাতার মতো আরও একটি দর্শনীয় প্রাসাদ গড়ে তোলেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হননি। মনের মতো বাড়ি হল না বটে, কিন্তু যা তিনি গড়লেন তাও অমরাপুরী। সেখানে দ্রুত পেঁছোতে হলে জলপথই ধরতে হবে এমন কোনও কথা নেই। ওয়েলেসলির দৌলতে বারাকপুরের সড়ক নদীর মতোই মসৃণ। লাল সুরকির সেই সড়ক তীরের মতো সোজা ছুটে গেছে বারাকপুরের দিকে। তার দু'ধারে সার করে লাগানো হয়েছে রকমারি গাছ। অনেক গাছ নষ্ট হয়ে যায় ১৮৬৪ সনের ঝড়ে। রাস্তা উন্নত করার দশ বছরের মধ্যেই চালু হয় কলকাতা-বারাকপুর রয়াল মেল কোচ। মেলগাড়ির ভেতরে ছয় জন, ছয় জন বাইরে। প্রায় আধা শতক পরে লেডি ক্যানিং সে পথে যেতে যেতে চমৎকৃত।—আঃ, কী ঘন সবুজ। যেন বিষাক্ত!

আজকের লাটবাগান দেখে সেদিনের বারাকপুর পার্কের জলুস অনুমান করা যায়। বারাকপুরের পার্ক এখনও সুন্দর। এখনও দাঁড়িয়ে আছে বড়লাটদের স্মৃতিবিজড়িত সেই প্রাসাদ। এক এক রাত্রে সেখানে স্বর্গের পরিবেশ। গণ্যমান্যদের বিশাল জমায়েত। পরীদের হাট। বিশপ হিবার এই প্রাসাদের হলে দাঁড়িয়ে তত্ত্ব কথা শুনিয়েছেন বিশিষ্ট সাহেব বিবিদের। নদীর ওপারে দিনেমারদের শ্রীরামপুর থেকে ভোজসভায় যোগ দিতে এসেছেন কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড। তারপর ফ্ল্যাগস্টাফ হাউস। সম্ভবত সেটিই এখন রাজ্যের রাজ্যপালের বিশ্রাম কুঠি। ড্রামারের বাংলো। এবং বিখ্যাত সেই 'হনিমুন হল', যেখানে কারও না কারও বন্ধুত্বের সূত্রে নববিবাহিতদের আনাগোনা। ওদিকে গ্রীক মন্দিরের স্টাইলে গড়ে তোলা স্মরণ-সৌধ। তার প্রাঙ্গণে আজ কলকাতার ময়দান থেকে উৎখাত ব্রোঞ্জ-পুরুষেরা আবার পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেয়েছেন। নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে গেলে হঠাৎ সামনে বিশাল বট। তারও অনেক বয়স। আগাছা আর ঝোপঝাড় থেকে এই মহাবৃক্ষকে উদ্ধার করেছিলেন লেডি ক্যানিং। অদূরে শায়িত তিনি। পাশে ঘোড়ার পিঠে লর্ড ক্যানিং। আমাদের স্বাদেশিকতায় তাঁরা দু'জনে আজ আবার কাছাকাছি। পাশাপাশি।

আরও অনেক স্মৃতিই ছড়িয়ে আছে আজকের বারাকপুরের উদ্যানে। এমনকি ক্যান্টনমেন্টের দিকে এক কোণে সিপাহি মঙ্গল পান্ডের স্মারকও। কিন্তু বলাই বাহুল্য, আজকের বারাকপুরের সঙ্গে অনেক ফারাক সেদিনের বারাকপুরের। তখনও গরমে রাজধানী কলকাতা থেকে সিমলায় পালিয়ে যাওয়ার হিড়িক শুরু হয়নি। হিমালয়ের দিকে প্রথম ঝোঁক দেখিয়েছিলেন লর্ড আমহার্স্ট, ১৮২৯ সনে। 'চলো সিমলা' ধ্বনি বাস্তবে পরিণত হয় ১৮৬৪ থেকে। তার আগে পর্যন্ত বারাকপুরই গভর্নর জেনারেলদের গ্রীষ্মের আস্তানা। গরমে প্রায়শ

কলক.তা থেকে তাঁরা পালিয়ে আসেন এখানে। কেউ কেউ সপ্তাহে দু'তিন দিন নিয়মিত। বারাকপুরে বসে যেমন নিঃশব্দে কাজ করা যায়, তেমনই উপভোগ করা যায় জীবনকেও। পার্কে সুন্দর চিড়িয়াখানা। ইচ্ছা করলে কাছেভিতে শেয়ার শিকারেও বের হওয়া যায়। একসময় একটি গলফ কোর্সও তৈরী করা হয়েছিল সেখানে। আর কিছু না হোক, এখানে পথে পথে বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ানোয়ও আনন্দ। লেডি মিন্টো লিখছেন—বার.কপুর ইজ ডিলিসিয়াস অ্যান্ড টেক্স দি স্প্রিং আউট অব ইন্ডিয়া! মাঝে মধ্যেই কলকাতা থেকে অনেক শৌখিন সাহেব-বিবি ভিড় জমাতেন সেখানে। ইমা রবার্টস লিখছেন—১৮৩৫ সনে একবার এক ভোজের আসরে যোগ দিতে গিয়ে বিপত্তি। হঠাৎ ঝড়। নৌকোয় যাঁরা আসছিলেন তাঁরা ভিজে কাদা। ডাঙার পথিকরাও কাদায় জলে একাকার। বারাকপুরে তবু অনেক মজা। যখন বিশিষ্ট কেনও অতিথি আসেন লাটগিন্নিরা তখন আরও খুশি। কাউকে নিজেদের বৈভব দেখাতে হলেও একবার না একবার এখানে টেনে আনা চাই। ফরাসী অতিথি ভিক্টর জাঁকজমক নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন লেডি বেন্টিংক।—সে কী আনন্দ!

বারাকপুরের হাতিশালে ১৮৫২ সনেও ১৪৬টি হাতি। চারটি গাড়ির জন্য আস্তাবলে সব সময় মোতায়েন ১৬টি তাজা ঘোড়া। ফ্ল্যাগস্টাফ ঘাটে বাঁধা বাহারি ময়ূরপঙ্খী নৌকো। নৌকো বিলাসেও অসুবিধে নেই কোনও।

সেই স্বর্গেই সহসা দৈত্যের পদধ্বনি।—বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো! এ লড়াই ইজ্জতের লড়াই! এ লড়াই ধর্মের লড়াই! লাট বাগানের খাঁচায় আটক সিংহের মতো কোয়ার্টার গার্ডের সামনে অস্থির পায়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে যাচ্ছে সিপাহি মঙ্গল পান্ডে। বসন্তের বিকালে তার হাতের বন্দুকের গর্জনে নিশ্চয় কেঁপে উঠেছিল বারাকপুরের নন্দন কানন। ঝিলের ধারে গাছের ডালে বসা পাখিরা নিশ্চয় ভয়ে আবার ডানা মেলেছিল আকাশে। মুহূর্তে নিশ্চয় এ-বাংলো সে-বাংলো হয়ে একটা হাতবোমার মতো সে দুঃসংবাদ আছড়ে পড়েছিল লাট সাহেবের প্রাসাদের বারান্দায়। সান্ত্রীরা আরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। আরও সতর্ক।

বারাকপুরে সেই প্রথম বিদ্রোহ নয়। লর্ড কার্জন লিখেছেন— মিউটিনি উড সিম টু হ্যাভ বিন ইনডিজিনাস ইন দি অ্যাটমোস্ফেয়ার অব বারাকপুর।" বারাক-পুরের হাওয়ায় ওড়ে বিদ্রোহের বীজ। বাঙালী ভাষাতত্ত্ববিদ তাই বুঝি বারাক-পুরকে বলেন, জাগ্রত গ্রাম।

এখানে প্রথম ফৌজী বিদ্রোহ ১৮২৪ সনে। মঙ্গল পান্ডে রুখে দাঁড়াবার তেত্রিশ বছর আগে। তখন ব্রহ্মযুদ্ধ চলছে। দূরের দেশ। বারাকপুর থেকে সেখানে সৈন্য পাঠানো দরকার। জলপথে সেটা সম্ভব নয়। কারণ সিপাহিরা কালাপানি পার হবে না। এক সময় সমুদ্র ওদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল না। কলকাতা উদ্ধারের সময় (১৭৫৬) ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে সিপাই নিয়ে এসেছিলেন জলপথে। ১৭৬২

সনে ৬২০ মাদ্রাজী সৈন্য দূর ম্যানিলা পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিল সমুদ্র পথে। তখন বেঙ্গল আর্মির সিপাইরাও নিঃশব্দে সমুদ্রে ভাসত। ১৮৬৭ সনে দুই ব্যাটেলিয়ান কলকাতা থেকে জলপথেই মাদ্রাজ গিয়েছিল। জলপথে নানা সমস্যা। রান্না বান্না পুজো আর্চার সুযোগ নেই। ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় আছে। তাছাড়া ঝক্কি ঝামেলাও অনেক। অনেক সময় সিপাইকে অনাবশ্যক পথে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ১৭৬৭ সনে তাই স্থির হল আর কালাপানি পাড়ি দেওয়া নয়। উচ্চবর্ণের পক্ষে এটা শাস্ত্রের নিষেধ। সিপাই হাঁটা পথে যেখানে খুশি যেতে রাজী, কিন্তু জলপথে নয়। বারাকপুরের সিপাহিরা ব্রহ্মে যাবে ডাঙা পথেই। প্রথমে চট্টগ্রাম। তারপর আরাকান। ৪৭ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিপাইরা যাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ রকমারি সমস্যা। প্রথমত বলদ পাওয়া ভার। বলদ ছাড়া সিপাইয়ের মোট বইবে কিসে? বলদ ভাড়া অবশ্য বহন করতে হয় সিপাইকেই। কোম্পানি এই বাবদে বাড়তি কিছু দেয়। কিন্তু যুদ্ধের বাজার। বারাকপুরে এই ভারবাহী প্রাণীটিকে খুঁজে পাওয়া ভার। কর্তৃপক্ষ বললেন—ঠিক আছে আমরা জোগাড় করে দিচ্ছি। কমান্ডিং অফিসার কার্টরাইট কোম্পানি পিছু ১০টি করে বলদ সংগ্রহ করলেন। সরকার বললেন—এসব বলদের খরচ আমরা বহন করব না। বরং সিপাইদের বলদ কেনার জন্য আগাম দেওয়া যেতে পারে। সিপাইরা বেঁকে বসল। তারা বলল—আমরা নিখরচায় বলদ চাই। আমাদের পিঠের বোঝা বইবার যে 'ন্যাপস্যাক' তা পুরানো হয়ে গেছে, পালটে দিতে হবে। দিতে হবে অন্তত দ্বিগুণ ভাতা। আরও নানা দাবি। যেদিন তাদের ব্রহ্মদেশের দিকে যাত্রা করার কথা সেদিন তারা দল বেঁধে প্যারেড গ্রাউন্ডেই বসে রইল। সেদিন ১ নভেম্বর, ১৮২৪।

মধ্য রাত্রে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন প্রধান সেনাপতি সার এডোয়ার্ড প্যাগেট। তিনি শৃঙ্খলা আর শৃঙ্খল ছাড়া কিছু বোঝেন না। কলকাতা এবং দমদম থেকে তিনি গোরা সৈন্য তলব করলেন। ২ নভেম্বর তারা এসে পেঁছিল বারাকপুরে। ওরা প্রধান সেনাপতির কাছে মিলিতভাবে একটা দরখাস্ত পেশ করল। বক্তব্য: আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা আর ফৌজে কাজ করব না। যে যার দেশে ফিরে যাব। প্রধান সেনাপতি বললেন—তা হয় না। তোমাদের সরকার বাহাদুরের হুকুম মানতেই হবে। নয়তো তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। ওরা হাতিয়ার হাতছাড়া করতে রাজী হল না। তারা আত্মসমর্পণে রাজী নয়।

গোলন্দাজরা তৈরী হয়েই ছিল। প্রধান সেনাপতির ইঙ্গিতে তারা কামান দাগতে আরম্ভ করল। সিপাহিরা এর জন্য তৈরী ছিল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যে যেদিকে পারে ছুটছে। বেশ কিছু সিপাহি মারা পড়ল। অনেকে নদী সাঁতরে ওপারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ জলে ডুবে প্রাণ হারাল। অন্যরা বন্দী হল। সামরিক আদালত বন্দীদের মধ্যে ৪১ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তার মধ্যে ১২ জনকে পরদিনই হত্যা করা হল। বাদ বাকিদের প্রাণদণ্ডের বদলে দণ্ড ধার্য হল যাবজ্জীবন সশ্রম

কারাবাস। শুধু তাই নয়, বেঙ্গল আর্মি থেকে মুছে দেওয়া হল রেজিমেণ্টের নাম।

ক্যাণ্টনমেণ্টে যখন এসব ঘটছে লর্ড আর লেডি আমহার্স্ট তখন অদূরেই লাটসাহেবের প্রাসাদে। লেডি আমহার্স্ট লিখছেন—ঘটনাস্থল বড়জোর সিকি মাইল দূরে। বিদ্রোহের খবর শুনে আমরা আতঙ্কিত। বলতে গেলে এখানে কোনও ইংরাজ বাহিনী নেই। তারপর ওরা এল। ইংরাজ সৈন্যরা ছাউনি ফেলেছিল আমাদের বাগানে। অন্য সময় হলে সেটা কী আনন্দের ব্যাপারই না হত। কিন্তু এখন সকলের চোখে মুখে উদ্বেগ,—কী হয়, কী হয়। শেষে গোলাগুলি। অনেকগুলি এদিকেও ছিটকে এসেছিল। কিছু পাচকদের ঘরে। কেউ কেউ আহতও হয়েছিল। নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল অন্তত কুড়ি থেকে তিরিশটি দেহ।

এই ঘটনার সাত বছর পরে বারাসতে তিতুমীরের বিদ্রোহ। বারাকপুরে নিশ্চয়ই সেদিনও উত্তেজনা। কার্জন লিখেছেন—খাস বারাকপুরেই আরও একবার বিদ্রোহ হতে যাচ্ছিল। ১৮৫২ সনে। সেবারও উপলক্ষ ছিল—কালাপানি। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে বারাকপুর। তবে বারাকপুরের স্মৃতিতে তখনও পর্যন্ত ১৮২৪ সনের ঘটনা। তেত্রিশ বছর পরে সেই দুঃস্বপ্নের দিনই কি ফিরে এল বারাকপুরে? মঙ্গল পাণ্ডে সেদিন ফিরিঙ্গীর বুক নিশানা করে তার বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিয়েছিল। বারাকপুরে সেদিন কোনও ইংরাজ বাহিনী নেই বললেই চলে। অথচ এদিকে বারাকের পর বারাক বোঝাই দিশি সিপাই। ২নং গ্রেনেডিয়ার বাহিনী ছাড়াও সেখানে মোতায়েন তখন ৪৩ নম্বর লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ৩৪ এবং ৭০ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি। মঙ্গল পাণ্ডে ৩৪-এর সিপাই। অন্যরা যদি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিযে বারাক ছেড়ে সেদিন বেরিয়ে আসত বাইরে, তবে? বারাকপুরের সাজানো বাগানের মুখ হয়তো সেদিন ভয়ে শুকিয়ে এসেছে। শেষ মার্চের বিকেল। বারাকপুরে হয়তো তখনও শীত শীত ভাব। এখানে ওখানে বাংলোগুলোতে হয়তো রীতিমত কাঁপুনি। চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। বিশেষত, ইদানীং কানাঘুষায় যেসব খবর ভেসে আসছে এই নন্দন কাননে সেগুলো মোটেই স্বস্তিকর নয়। দমদমে নাকি চাঞ্চল্য। কলকাতায় ফিসফাস গুঞ্জন। গত মাসে হঠাৎ একদিন বারাকপুরের টেলিগ্রাফ অফিসটি পুড়ে গেল। তারপর বহরমপুরের ঘটনা। সব মিলিয়ে বারাকপুর এমনিতেই ইদানীং গম্ভীর। আবহাওয়ায় অবিশ্বাসের গন্ধ। তারই মধ্যে সব জল্পনার উপসংহার ঘটিয়ে দিল মঙ্গল পাণ্ডে। মঙ্গল পাণ্ডের হাতের বন্দুক গর্জে উঠে জানিয়ে দিল, ভয় অমূলক নয়। বারাকপুরের গোরাদের মুখ ভয়ে নীল। কলকাতা চিন্তায়।

আর দেরী করা উচিত নয়। এ-স্ফুলিঙ্গ যত দ্রুত নিবিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। সামরিক আদালত গঠন করেছেন জেনারেল হিয়ার্সে। বারাকপুর কোম্পানির ফৌজের প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের সদর দপ্তর। মেজর জেনারেল জন বি হিয়ার্সে তার প্রধান। তিনি প্রবীণ সৈনিক, দায়িত্বশীল সেনাপতি। বয়স হয়েছে অনেক। কিন্তু এখনও তাঁর মজবুত শরীর। তাঁর উৎসাহ অফুরন্ত। তিনি হো হো করে

হাসেন। কথা বলেন প্রাণখুলে। একটু হামবড়া ভাব আছে বটে, কিন্তু মানুষটি ভাল। শোনা যায় তাঁর বাবা ছিলেন আধা-ভারতীয়, তাঁর বৈমাত্র ভাইও তা-ই। জেনারেল হিয়ার্সে গড়গড় করে হিন্দুস্থানী বলতে পারেন। টোটা নিয়ে ফিসফিস শুরু হতে না হতে তিনি সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন। তখন কেউ তার কথা কানে তোলেননি। শেষ পর্যন্ত তো প্রমাণ হয়ে গেল তিনি সঠিক পরামর্শই দিয়েছিলেন। যা হোক, সৈনিক তিনি। দায়িত্ব তার আগে কর্তব্য পালন। যে করে হোক, বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে তাঁকে। এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিতে হবে এই আগুন।

মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহী হয় ২৯ মার্চ। বারাকপুরে তার বিচার সভা বসে ৬ এপ্রিল। বিচার সভা মানে নেটিভ কোর্ট মার্শাল। সভাপতি—৪৩ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সুবাদার-মেজর জওহরলাল তেওয়ারি। সদস্য নানা রেজিমেণ্টের হিন্দু মুসলমান চৌদ্দজন সুবাদার ও জমাদার। সাহেবদের তরফে হাজির ডেপুটি জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল ক্যাপ্টেন জি সি হ্যাচ, প্রসিকিউটার এস জি হুইলার, দোভাষী লেঃ জেমস ভালিংস। অধিবেশন বসে ক্যাণ্টনমেণ্টের মেস হাউসে। বেলা ১১টায়। হাতকড়া পরা মঙ্গল পাণ্ডেও হাজির সেখানে। ডাক্তাররা বলেছেন—সে আদালতে হাজিরা দিতে পারে। ৫৩ নম্বর রেজিমেণ্টের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন টি বি রিড কাগজে কলমে বলছেন—আমার চিকিৎসাধীনে মঙ্গল পাণ্ডের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। সে ক্রমেই আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন খুবই কাহিল অবস্থা তার। ক্ষতের জন্য তার চেহারাও যাচ্ছেতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু আমি মনে করি তাকে ৩৪ নম্বরের মেস হাউসে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

৩৪ নম্বরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন জেমস অ্যালেনেরও মোটামুটি একই বক্তব্য। তিনি লিখেছেন, মঙ্গল পাণ্ডে আজ তার বিচার সভায় যোগ দিতে পারে। সুতরাং মঙ্গল উপস্থিত।

আনুষ্ঠানিক ভাবে আদালতের কাজ শুরু হল। জজ অ্যাডভোকেট হ্যাচ সাহেব বললেন—সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে, যাঁরা তোমার বিচার করতে বসেছেন তাঁদের কারও সম্পর্কে তোমার কি কোনও আপত্তি আছে?—না, আমার কোনও আপত্তি নেই। জবাব দিল মঙ্গল পাণ্ডে।

এবার গম্ভীর ভাবে পড়ে শোনান হল অভিযোগের বয়ান। অভিযোগ দুটি। এক—বিদ্রোহ। দুই—বিদ্রোহকালে ওপরওয়ালা অফিসারদের হত্যার চেষ্টা। অভি-যোগের উপস্থাপক প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাডজুট্যাণ্ট মেজর এ এইচ রস। দলিলে তিনি সই করেছেন আগের দিন, অর্থাৎ ৬ এপ্রিল। জজ-অ্যাডভোকেট হ্যাচ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে, তুমি কি দোষী, না নির্দোষ? —নির্দোষ। জবাব দিল মঙ্গল পাণ্ডে।

আদালতের নির্দেশে বন্দীর হাত থেকে কড়া খুলে নেওয়া হল। কর্নেল হুইলার শপথ নিলেন। শুরু হল তাঁর জেরা।

—আপনি কি ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্টের অধিনায়ক?
—হ্যাঁ।
—২৯ মার্চ আপনি কি আপনার রেজিমেণ্টের কোয়ার্টার গার্ডের কাছে গিয়েছিলেন?
—হ্যাঁ।
—কেন গিয়েছিলেন?
—সেদিন বিকালে ক্যাপ্টেন ড্রুরি এসে খবর দিলেন যে একজন সিপাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্যদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে বিদ্রোহ করতে। আমি তাঁর সঙ্গেই প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়েছিলাম।
—সেখানে আপনি কী দেখলেন?
—আমি দেখলাম, এই বন্দী কোয়ার্টার গার্ডের সামনে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে। একবার এদিকে যাচ্ছে, আর একবার ওদিকে। তার হাতে বন্দুক। কোমরে ঝুলছে তলোয়ার। আমি গিয়েই শুনলাম এই কয়েদি লেঃ বগ এবং সার্জেণ্ট মেজরকে আহত করেছে। আমি কোয়ার্টার গার্ডে তিন চারজনকে বললাম বন্দুকে গুলি ভরতে। নেটিভ অফিসার ইন কমাণ্ড যে ছিল তাকে বললাম ওকে পাকড়াও করতে। সে ইতস্তত করছিল। বলেছিল—কোনও সিপাই ওকে ছুঁবে না। আমি দু'তিনবার তাকে একই কথা বললাম। শেষ পর্যন্ত সে অর্ডার দিল বটে, কিন্তু সিপাইরা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। নেটিভ অফিসার আমার কাছে ফিরে এসে বলল—ওরা আর এগোবে না। প্যারেডের মাঠে তখন বিগ্রেডিয়ারও হাজির। আমি তাঁকে সব বললাম। ইতিমধ্যে পেছন দিক থেকে জেনারেল নিজেই এসে হাজির হলেন। তিনি বিগ্রেডিয়ারের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন। তারপব এগিয়ে গেলেন কোয়ার্টার গার্ডের দিকে। সঙ্গে ক'জন অফিসারও এগোলেন। জেনারেল নেটিভ অফিসারকে বললেন—তোমার সিপাইদেরও নিয়ে এস। ওরা আরও কয়েক পা এগোল। এই বন্দী তখনই নিজেকে গুলি করে।...
—ইদানীং তুমি কি সিপাহিদের মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য লক্ষ করেছ? আশা করা যায় না এমন কোনও হাবভাব?
—জানুয়ারির শেষ দিকে সিপাহিরা নতুন টোটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে খুব বলাবলি করছিল। এই টোটা কী দিয়ে তৈরি তা-ই নিয়ে নানা গবেষণা। ওদের ধারণা হচ্ছিল আমরা ওদের জোর করে খ্রীস্টান করব।
—এই সন্দেহ দূর করার জন্য আপনার জ্ঞানত মেজর জেনারেল কি কোনও চেষ্টা করেছিলেন?
—হ্যাঁ। ৯ ফেব্রুয়ারি জেনারেল প্যারেডে তিনি নতুন কার্তুজের কাগজ সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন।

—২৯ মার্চ কি এখানে নতুন কোনও ইংরাজ সৈন্য এসে পৌঁছায়?

—ঘাটে কিছু পৌঁছেছে—ফ্ল্যাগস্টাফ ঘাটে,—এইরকম খবর ছিল।

—তখন কি ১৯ নম্বর রেজিমেণ্টের এখানে এসে পৌঁছানোর কথা নয়?

—হ্যাঁ।

—সিপাহিদের কি জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন তাদের আনা হচ্ছে?

—১৮ মার্চ প্যারেডের সময় জেনারেল জানিয়ে দিয়েছিলেন বহরমপুরে কী ঘটেছে। তিনি এটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ১৯ নম্বর রেজিমেণ্টকে ভেঙে দেওয়া হবে।

মঙ্গল পাণ্ডে নিঃশব্দে সব শুনে গেল। বলল না কিছুই। সাহেবকে তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করবে? জানতে চাইলেন আদালত। সে মাথা নেড়ে জানাল তার কোন ইচ্ছে নেই।

হুইলার সাহেবকে কী আর জিজ্ঞাসা করবে মঙ্গল পাণ্ডে। সে জানত সাহেব যা বলেছেন সত্য। সবই তার জানা খবর। দমদম, বারাকপুর, রাণীগঞ্জ, বহরমপুর, কলকাতা—কোনও খবরই তার অজানা নয়। সত্য বলতে কি, কোন্ সিপাই না জানে সেসব কথা। সরকারী খবরাখবর যত ধীরেসুস্থে চলে বাজারের খবর ছোটে তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত। তারের চেয়েও তাড়াতাড়ি।

দমদমের ঘটনা ক'মাস আগের। উপলক্ষ একটি লোটা। 'জানুয়ারি মাসের একদিন একজন নীচ জাতীয় লস্কর জলপান করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ সিপাহির নিকট তাহার লোটা চায়, সিপাহি ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং আপনার জাতির শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়া লস্করকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। লস্কর বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া কহে 'উচ্চ জাতি ও নীচু জাতি বস্তুত কিছুই নহে, সমস্তই এক হইয়া যাইবে, যেহেতু টোটা গোরু শুকরের চর্বিতে প্রস্তুত হইতেছে, ওই টোটা সিপাহিদিগের সকলকেই ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং কোম্পানির রাজত্বে আর জাতিবিচার থাকিবে না।' এই বহু কথিত উপাখ্যানটি বর্ণনা করে বাঙালী ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন—"ব্রাহ্মণ অধীর হৃদয়ে লস্করের নিকট হইতে চলিয়া গেল, অধীর হৃদয়ে তাহার দলস্থ লোকদিগের নিকট লস্করের কথা কহিল। অবিলম্বে দমদমার প্রত্যেক সিপাহি এই কথা শুনিতে পাইল।"

শুধু কি দমদমে? কোথায় নয়? ব্রাউন বেস বন্দুকের বদলে তুলনায় হালকা বন্দুক এনফিল্ড যখন এলো তখন তা চালাবার জন্য প্রথম যে তিনটি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয় তার একটি ছিল এই দমদমে। দমদমে তার আগে থেকেই ফৌজী আড্ডা। দিনরাত গোলাগুলির আওয়াজ সেখানে। এই দুমদুম আওয়াজ থেকেই দমদমা। ক্রমে দমদম। নতুন রাইফেলের আর দুটি শিক্ষা কেন্দ্র ছিল মীরাট এবং আম্বালায়। নতুন রাইফেলের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নতুন টোটা। ক' বছর আগে

বিলেত থেকে আমদানি করা হয়েছিল এই টোটা। এখন দমদমেও তৈরী হচ্ছে। কোম্পানির ইচ্ছা উন্নততর বন্দুক এবং টোটা ক্রমে সারা ভারতে চালু করে দেওয়া। উত্তেজনা এই টোটা ঘিরেই। ২২ জানুয়ারি দমদম থেকে লেঃ রাইট তাঁর ওপর-ওয়ালা মেজর বার্নাটনকে জানান, টোটা নিয়ে দমদমে সিপাহিদের মুখে নানা প্রশ্ন। বার্নাটন রিপোর্ট করেন বারাকপুরে জেনারেল হিয়ার্সেকে। হিয়ার্সের কাছে সে-খবর পেঁছানোর অনেক আগেই নিশ্চয় তা পেঁছেছিল মঙ্গল পাণ্ডের কানে। আগেই বলেচি এদেশে মুখের কথায় পবনের বেগ। তাছাড়া বারাকপুর থেকে দমদম কতটুকু আর পথ। যা হোক, হিয়ার্সে সময় নষ্ট না করে তক্ষুনি চিঠি লিখতে বসলেন ফোর্ট উইলিয়ামে অ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেলকে। সেদিন ২৪ জানুয়ারি। চিঠির ওপর ছাপ দিলেন—'অত্যন্ত জরুরী।' কিন্তু সে সব খবর কেউ কানে তুললেন না। ২৮ তারিখে আবার লিখতে বসলেন তিনি—চারদিকে গুজব, আমরা নাকি ওদের খ্রীস্টান করব। আরও উদ্বেগজনক খবর, রানীগঞ্জে একজন সার্জেণ্টের বাংলোয় আগুন লাগানো হয়েছে। বারাকপুরেও আগুন লাগছে। গত চার দিনের মধ্যে টেলিগ্রাম অফিস ছাড়াও এই বারাকপুরে আরও তিনটি অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সিপাহিরাই এসব করছে।

মঙ্গল পাণ্ডে, তুমিও কি ছিলে সে দলে। ওই যারা টোটা নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছিল তুমিও কি তাদের একজন ছিলে? হয়তো সত্যই বিশ্বাস করতে তুমি ওরা তোমার ধর্ম নষ্ট করতে চায়। তোমার জাত নষ্ট করতে চায়। তোমাকে খ্রীস্টান করতে চায়। তাই কি রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি এগিয়ে গিয়েছিলে টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে? ওরা বলে সিপাহিরা আগুন দিত তীরের ফলায় তেলে ভিজানো কাপড় জড়িয়ে। জ্বলন্ত তীর উড়ে এসে পড়তো বাংলোর চালে। কৌশলটা প্রথমে শিখেছিল নাকি ২ নম্বর গ্রেনেডিয়ার বাহিনীর সিপাইরা সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়। তোমরা কি আয়ত্ত করেছিলে এই চমৎকার বিদ্যা। এমন কি দূর আম্বালায়ও নাকি আগুন দেওয়া হচ্ছিল এই কৌশলে। ওরা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারছিলেন না তীরন্দাজদের। হাতে নাতে ধরতে পারছিলেন না কোনও সিপাইকে। তুমি যদি আগেই ধরা পড়ে যেতে তাহলে ২৯ মার্চ কোয়ার্টার গার্ডের সামনে তোমার ওই চেহারা দেখা যেত না। 'পাণ্ডে' এই শব্দটির প্রতিশব্দ হত না বিদ্রোহী সিপাহি।

যাহোক, সিপাইদের চাঞ্চল্য দেখে হিয়ার্সে নিজেই খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। সিপাইদের মনের খবর জানার জন্য ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে এক তদন্ত আদালত বসল বারাকপুরের ছাউনিতে। অনেক সিপাইকেই জেরা করা হল। সে দলে মঙ্গল পাণ্ডে ছিল কি না জানি না। হয়তো ছিল হয়তো ছিল না। তবে সবাই প্রায় একবাক্যে বলল—টোটা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। ওই টোটার গায়ে যে কাগজ তা তাদের জাতধর্ম নষ্ট করবে। তারা একটা বিহিত চায়।

শুধু বারাকপুর কেন, টোটার প্রশ্ন ইতিমধ্যে বলতে গেলে গোটা ভারতে।

মহাবিদ্রোহের কার্য-কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। নিশ্চয় ভবিষ্যতেও হবে। রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক—বিদ্রোহের পিছনে নিশ্চয় হাজার কারণ। টোটা নিমিত্ত মাত্র। সন্দেহ নেই টোটার প্রশ্ন না-থাকলেও অন্য কিছু খুঁজে নিত বিদ্রোহীরা। তবু চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল করে সেই অভিশপ্ত টোটা। কে জানত সামান্য এক বন্দুকের টোটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরি। একদিন তা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে। এই টোটার থেকেই গলগল করে বেরিয়ে আসবে তপ্ত লাভার মতো ঘৃণার স্রোত।

হিয়ার্সে বুঝতে পারছেন না তিনি কী করবেন। সিপাহিরা যে উত্তেজিত সে-বিষয়ে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নেই। ওরা নিজেরাই কবুল করেছে সে-কথা। ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখে শোনা গেল ওরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ৩৪ নম্বর বাহিনীর একজন সিপাহি এক অফিসারের কানে পেঁছে দিয়ে গেছে সে-বার্তা। সিপাইরা বলছে ওরা সব ছারখার করে দেবে। অফিসারদের বাংলো জ্বালাবে, তাঁদের খুন করবে। পুরো ক্যানটনমেণ্ট কব্জা করে তারা রওনা হবে কলকাতার দিকে। ৩৪ নম্বরের এক জমাদার এসে ফিসফিস করে বলে গেল একই খবর—সিপাইরা ষড়যন্ত্র করছে। ৫ ফেব্রুয়ারি রাত্রে তারা প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা করেছে। প্রায় তিনশ' লোক ছিল সেখানে। নানা রেজিমেণ্টের সিপাহি তারা। প্রত্যেকের মাথায় মুখে কাপড় জড়ানো, শুধু মুখ আর চোখ দুটি খোলা। জমাদাব নিজেও হাজির ছিল সভায়। তাকে ওরা ডেকে নিয়েছিল। বলেছিল—তুমিও যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। এ-লড়াই জাত ধর্ম রক্ষার পবিত্র লড়াই। মঙ্গল পাণ্ডে, তুমি কি সে-সভায় বক্তা ছিলে, না শ্রোতা? সেই অন্ধকারে নিশ্চয় জ্বলছিল তোমাব চোখে। তুমি কি সেদিনই বলিপ্রদত্ত?

হিয়ার্সে এইসব বিবরণ জানিয়ে কলকাতার কর্তাদের লিখলেন—শিকড় অনেক গভীরে চলে গেছে। বারাকপুর এখন বিস্ফোরণের মুখে কোনও মাইন যেন। এদিকে কোনও সাহেব উড়ো চিঠি পেতে লাগলেন। বক্তব্য ঃ সাবধান। তোমরা আমাদেব জাত নষ্ট করছ। ধর্ম নষ্ট করছ। বারাকপুরে পথ আর চাপাটি ফিরি হওযাব কোনও খবর নেই। মাঝে মাঝে শুধু উড়ো চিঠি।

ফেব্রুযারির ৯ তারিখে জেনারেল হিয়ার্সে সব সিপাইকে প্যারেডের মাঠে ডাকলেন। অনর্গল হিন্দুস্থানীতে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন—নতুন কার্তুজ নিয়ে সন্দেহ অহেতুক। তোমাদের খ্রীস্টান করা হবে—এ ধরনের চিন্তারও কোনও মানে হয় না। এসব উদ্ভট চিন্তা। কাউকে জোর করে খ্রীস্টান করা হবে না। খ্রীস্টান ধর্মে তা নিষিদ্ধ। তাঁর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা।

সিপাইরা মন দিয়ে শুনল তার কথা। এই বৃদ্ধ জেনারেলকে তারা অপছন্দ করে না। তিনি সিপাইদের মন বোঝেন। অন্তত বোঝার চেষ্টা করেন।—মঙ্গল পাণ্ডে, তুমিও তো নিশ্চয় হাজির ছিলে প্যারেডের মাঠে। জেনারেল কী বলছেন, তাঁর প্রতিটি কথা ওজন করে দেখছিলে। অন্যরা কেউ কেউ হয়তো মোটামুটি

আশ্বস্ত হয়েছিল তাঁর কথাবার্তায়। কিন্তু তুমি হওনি। তাই / না? কারণ, তোমার ভয় ততদিনে আরও জমাট বেঁধেছে। তোমার সংকল্প লোহার মতো কঠিন হয়ে উঠেছে। তুমি কোনও ফিরিঙ্গিকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলে না।— তাই না?

অবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল ক'দিনের মধ্যে। সরকার ৩৪ নম্বর রেজিমেণ্টের দুটি অংশকে হুকুম দিলেন বহরমপুরে মার্চ করতে। মতলব বারাকপুরে সিপাইদের কমজোরি করে তোলা। নানা ছুতোয় ষড়যন্ত্রের পরিমণ্ডলটিকে তছনছ করে দেওয়া। বারাকপুর চঞ্চল হয়ে উঠল। ওদিকে বহরমপুরেও চাঞ্চল্য। বারাকপুর থেকে একটি দল সেখানে পেঁছায় ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে, দ্বিতীয় দল ২৫ তারিখে। সেখানে মোতায়েন ১৯ নম্বর রেজিমেণ্টের সঙ্গে আগে থেকেই বারাকপুরের অনেক সিপাইয়ের আলাপ পরিচয়। এক সময় এক সঙ্গে ওরা লক্ষ্মৌয়ে ছিল। সুতরাং, নিঃশব্দে সংক্রামিত হল সন্দেহ আর ঘৃণা। অবশ্য আবহাওয়া আগে থেকে তৈরী ছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে ১৯ নম্বর বাহিনী রুখে দাঁড়াল—তারা নতুন টোটা নেবে না। অ্যাডজুট্যাণ্টের মুখে খবর শুনে ওপরওয়ালা কর্নেল মিচেল চটে লাল। তিনি তক্ষুনি ছাউনির দিকে ছুটলেন। নেটিভ অফিসারদের হুকুম দিলেন কোয়ার্টার গার্ডের সামনে তক্ষুনি হাজির হতে। মিচেল হিয়ার্সে নন। তিনি হঠকারী যুবা। অভিজ্ঞতা কম। তিনি হুমকি দিয়ে বসলেন—সিপাইরা যদি কথা না শোনে তবে আমি তাদের বার্মায় কিংবা চীনে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তারা বেঘোরে মরবে। নয়তো তাদের জন্য তোমাদেরও গুরুতর শাস্তি পেতে হবে।

কর্নেলের মেজাজ দেখে সিপাইরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাইরে বীরত্ব দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কর্নেল মিচেল রীতিমত আতঙ্কিত। "কেননা বহরমপুরে একজনও গোরা সৈন্য নাই, পদাতিক কালা সিপাহি বিলক্ষণ দলপুষ্ট, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় অল্প, তাহারাও কালা লোক, তাহারাও যদি পদাতিক দলের ন্যায় বিরাগ লক্ষণ দেখায়, তাহাদের সঙ্গে যদি যোগ দেয় তাহা হইলে আরও বিপদ। এখন কি করা কর্তব্য? বিশেষ কিছু স্থির করিতে না-পারিয়া সেই রাত্রেই তিনি হুকুম জারী করিলেন—কল্য প্রাতঃকালে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণের প্যারেড হইবে।"

সেই শীতের রাতে বহরমপুর ছাউনিতে নানা নাটকীয় ঘটনা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে একদিকে মিচেলের গোলন্দাজ আর অশ্বারোহীরা, অন্যদিকে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ পদাতিক বাহিনী। তার সিপাইদের প্রত্যেকের হাতে বারুদ ভরা বন্দুক। মিচেল হুকুম দিলেন— তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। সিপাইরা বলল—যতক্ষণ না গোলন্দাজ এবং অশ্বারোহী-দের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ তারা অস্ত্র সমর্পণ করবে না। তারা আরও বলল মিচেল যদি তার গোলন্দাজ এবং ঘোড়সওয়ারদের হঠিয়ে দেন তবে তারা

নিঃশব্দে আজকের মতো ছাউনিতে ফিরে যাবে। তাঁর ঈশ্বর সেদিন মিচেলের সহায়। সহসা তাঁর সম্বিত ফিরে এসেছিল। হয়তো প্রাণভয়ে। হয়তো নির্বুদ্ধিতার পর হঠাৎ সুবুদ্ধি উঁকি দিয়েছিল তাঁর মাথায়। তিনি পিছু হঠে গেলেন। নেটিভ অফিসারদের অবশ্য তিনি হুকুম দিয়েছিলেন পরদিন প্যারেডের কর্মসূচী বহাল রাখতে। তাঁরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাহেবকে ক্ষান্ত করেন। তাহলে পরদিনও বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। ১৯ নম্বর তখনও অস্ত্র ত্যাগ করেনি। কর্নেল শেষ পর্যন্ত তাদের যুক্তি মেনে নিলেন। বিদ্রোহের আর এক বাঙালী ঐতিহাসিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সিপাহী বিদ্রোহ বা মিউটিনি) ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়ে লিখছেন—"গোলন্দাজ অশ্বারোহীরা ফিরিয়া গেল, রহিল কেবল প্রজ্জ্বলিত মশালগুলি। মিচেলের আদেশে মশালচীরাও প্রস্থান করিতে লাগিল। মশালের আলো যখন ক্রমে ক্রমে চক্ষের অগোচর হইয়া গেল সিপাহিরা তখন ভাবিল নিরাপদ।" নিরাপদ তারা হয়নি। ক'দিনের মধ্যেই গৃহীত হয়েছিল সিদ্ধান্ত : বিদ্রেহী ১৯ নম্বরকে ফৌজ থেকে বিদায় করা হবে। তাদের হুকুম দেওয়া হল বারাকপুরের দিকে মার্চ করতে। উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্য তারা তখনও জানে না।

কিন্তু বারাকপুরের সিপাহিরা নিশ্চয় সবই জানত।

মঙ্গল পাণ্ডে, বহরমপুরে যা হয়ে গেল তা কি তোমার অজানা ছিল? বোধহয় না। তুমি কি দূর বারাকপুরে বসেও মশালের আলোয় উদ্ভাসিত ওই মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলে না। ওরা একই সঙ্গে ভীত এবং ক্রুদ্ধ। ওরা উত্তেজিত। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। তোমার সংকল্প বুঝি দানা বাঁধছে। না, কোনও দ্বিধা নয়। একবার রুখে দাঁড়ালে তুমি আর পিঠ ফেরাবে না। পিঠে কেউ আদর করে হাত বুলালেও না। কারও পিঠ চাপড়ানিতেও তুমি আর ভুলছ না।

ফেব্রুয়ারি গড়িয়ে গেল। এলো মার্চ। বহরমপুর, বারাকপুর, দমদম—ছাউনিতে কম বেশি এখনও উত্তেজনা বহাল। আবহাওয়া থমথমে। তারই মধ্যে ১০ মার্চ খাস রাজধানীতে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। সেদিন ফোর্ট উইলিয়ামে পাহারা দিচ্ছে ২য় বাহিনীর দু'জন সিপাই। নাম বুধেলাল তেওয়ারি, আর বাহাদুর সিং। সান্ত্রীর ডিউটি। সে কাজ ফেলে তারা হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হল মিণ্ট-এর প্রহরীদের কাছে। সেখানে ৪ জন হাবিলদার, ৩ জন নায়েক এবং ৮৬ জন সিপাইকে নিয়ে পাহারাদারির কাজ করছে সুবাদার মুধা খান। রাত তখন সাড়ে দশটা। মুধা খান চারপায়ে বসে কী একটা পড়ছিল। ওরা নিঃশব্দে এসে তার সামনে দাঁড়াল। সাদা পোশাকে দুই জওয়ান। বলল—কেল্লা থেকে হাবিলদার মেজর আমাদের পাঠিয়েছে। মাঝ রাত্তিরে ক্যালকাটা মিলিসিয়া কেল্লায় হানা দিবে। গভর্নর জেনারেল রাত দশটায় ফৌজ নিয়ে যাচ্ছেন বারাকপুরে। তিনি ম্যাগাজিন দখল করে নেবেন। আমরা দখল করব কলকাতার কেল্লা। তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে চলে এসো। ওদের কথাবার্তা শুনে সুবাদার মুধা খান

রাগে কাঁপতে লাগল। সে নিমকহারাম হতে পারবে না। সে হুকুম দিল সিপাই দু'জনকে রাতের মতো আটকে রাখতে। ওরা অনেক অনুনয়-বিনয় করল ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু খান কিছুতেই রাজী হল না। সেই রাত্রে আবার একজন সিপাই চেষ্টা করেছিল ওদের মুক্ত করতে। খান রাজী হয়নি। পরদিন সে ওদের তুলে দিয়েছিল ওপরওয়ালাদের হাতে। ক'দিন পরে ফোর্ট উইলিয়ামে কোর্ট মার্শাল। ওরা নানা রকম ওজর দিয়েছিল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল নেপথ্যে ষড়যন্ত্র চলছে। অযোধ্যার নবাব এবং রাজা মান সিংহের চরেরা নাকি সক্রিয়। সক্রিয় নাকি এমন কি কলকাতার ধর্মসভাও। যা হোক, বিচারে দুই ষড়যন্ত্রকারীর জন্য ধার্য হল চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

মঙ্গল পাণ্ডের কানে এসব খবরও হয়তো পেঁৗছেছিল। তার চোখ কান নিশ্চয় খোলা ছিল। সে জানত কোথায় কী হচ্ছে। জানত ফিরিঙ্গীরা আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছে। ফ্ল্যাগস্টাফ ঘাটে কি সত্যই সেদিন গোরা সৈন্য নামেনি? নেমে-ছিল বই কি! পঞ্চাশ জনের একটি বাহিনী। কলকাতা থেকে ওদের পাঠিয়েছিলেন ডেপুটি কোয়ার্টার মাস্টার লেঃ কর্নেল স্যানডার্স। ওরা বারাকপুরে পেঁৗছেছিল স্টীমারে। হুইলার এদের কথাই বলছিলেন। মঙ্গল পাণ্ডেও ওদের কথা ভেবেই সেদিন আরও উত্তেজিত। আমরা আগেই শুনেছি সে হাঁক দিচ্ছিল—নিকালো পলটন, নিকালো হামারা সাথ।—গোরা লোগ আ গিয়া! ইউরোপীয়ানরা এসে গেছে! কর্নেল হুইলারের সাক্ষীতে স্পষ্ট হয়ে গেছে মঞ্চ তখন মঙ্গল পাণ্ডের মতো কোনও দুঃসাহসীরই প্রতীক্ষায়।

হুইলার বলেছেন জেনারেল অন্য অফিসারদের নিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছেন মঙ্গল পাণ্ডে তখনই গুলি করে নিজেকে। তিনি বিশদ করে কিছুই বলেননি। অন্য সাক্ষীরাও না। মঙ্গল পাণ্ডে কেমন করে ধরা পড়ল সামরিক আদালতের নথিপত্রে তার বিবরণ নেই। সে-বিবরণ রচনা করেছেন জেনারেল হিয়ার্সে স্বয়ং, ওই সব কাগজপত্র ভারত সরকারের সেক্রেটারির কাছে পাঠাবার সময়। এ-চিঠির তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৮৫৭।

হিয়ার্সে লিখছেন :

সেদিন ২৯ মার্চ। বেলা তখন পাঁচটা দশ মিনিট। ৩৪ নম্বর নেটিভ ইন-ফ্যানট্রির যে সিপাই আমার বাড়িতে আরদালির কাজ করে সে ছুটতে ছুটতে এসে বলল—ব্রিগেডের সিপাইরা প্যারেডের মাঠে জড়ো হয়েছে। সবাই সেদিকে ছুটছে। আমি তক্ষুনি আমার ঘোড়া আনতে হুকুম দিলাম। ইউনিফর্ম চাপিয়ে নিলাম। ছেলেকে বললাম—পিস্তলে গুলি ভরে দিতে। ওরা যখন এসব করছিল আমি তখন টেবিলে বসে ছোট্ট দুটি নোট লিখে ফেললাম। একটি চুঁচুড়ায়, হার ম্যাজেস্টির ৮৪ নম্বর পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল রিডকে। অন্যটি দমদমের অধিনায়ক কর্নেল আনসউইককে। তাঁদের নির্দেশ দিলাম চিঠি পাওয়া মাত্র ফৌজ নিয়ে বারাকপুরের দিকে রওনা হতে। আমি ভাবছিলাম যদি গোটা

ব্রিগেড বিদ্রোহ করে তবে গভর্নমেণ্ট হাউস রক্ষার জন্য ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে যে ৫০ জন গোরা সৈন্য আছে তাদের সঙ্গে এদেরও মোতায়েন করব। আমি চিঠিগুলো ভাঁজ করে সবে পকেটে রেখেছি, এমন সময় ৩৪ নম্বরের অ্যাডজুট্যাণ্ট লেঃ পাওয়েল ঘোড়ায় চড়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর হাতে এবং পোশাকে রক্ত। তিনি বললেন—অ্যাডজুট্যাণ্ট বগকে গুলি করা হয়েছে। তার ঘোড়া জখম হয়েছে। বগ তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। সার্জেণ্ট মেজর হিউসনও আহত।

তারপর এলেন সেই সপ্তাহের ফিল্ড অফিসার মেজর ম্যাথুস। তিনি জানালেন ব্রিগেডের সব সৈন্য ওখানে জমা হয়েছে। আমি জানতে চাইলাম—বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার বা গুলি করার কোনও চেষ্টাই কি করা হয়নি? ম্যাথুস বললেন, লেঃ কর্নেল হুইলার এবং অ্যাডজুট্যাণ্ট ড্রুরি সেখানে গেছেন উন্মাদকে পাকড়াও করার জন্য। আমি বললাম—ঘোড়া নিয়ে দৌড়াও। হুইলারকে গিয়ে বল—আমার আদেশ, বিদ্রোহী যদি ধরা না-দিতে চায় তবে গুলি করতে। পরে শুনেছি গার্ডের জমাদার বা অন্যরা হুইলারের আদেশ শুনতে রাজী হয়নি।

আমি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে আমার দুই ছেলে; ৩৮ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রির ক্যাপ্টেন জন হিয়ারসে এবং ৫৭ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রির লেঃ অ্যানড্রু হিয়ার্সে। দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট মতো এখন ছুটিতে আছে। আমরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ৩৪ নম্বরের প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে হাজির হলাম। সেখানে সিপাইদের ভিড়। সবাই প্রায় সাদা পোশাকে। কারও হাতে অস্ত্র নেই। নেটিভ অফিসাররাও সেখানে রয়েছে। তারা জনতাকে সুশৃঙ্খল রাখার চেষ্টা করছে। ডানদিকে ৩৪ নম্বরের সিপাইরাও জড়ো হয়েছে। তারাও নিরস্ত্র।

আমি মেজর রসকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কী? সেখানে তখন অনেক ইংরাজ অফিসার উপস্থিত। ব্রিগেডিয়ার গ্রাণ্ট, মেজর ম্যাথুস এবং আরও কেউ কেউ। কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ মাটিতে দাঁড়িয়ে। ওঁরা বললেন—৩৪ নম্বরের একজন সিপাই লেঃ বগ এবং ওই বাহিনীর সার্জেণ্ট মেজরকে তলোয়ারের ঘায়ে আহত করেছে। সে কোয়ার্টার গার্ডের সামনে ৭০/৮০ পায়ের মধ্যে পায়চারি করছে। অন্যদের আহ্বান জানাচ্ছে ধর্ম এবং জাত রক্ষা করার জন্য বেরিয়ে আসতে, ধর্মের জন্য জীবন দিতে। কেননা, ইউরোপীয়ানরা এসে গেছে।

মঙ্গল পাণ্ডে খারাপ ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিল। চিৎকার করে বলছিল—তোমরা আমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছ। এখন তোমরা এগিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছ না কেন?

লোকটিকে দেখে আমি কোয়ার্টার গার্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে তখন জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে এবং দশ বারোজন সিপাই দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে তখন দুই ছেলে আর মেজর রস। একজন অফিসার চিৎকার করে উঠলেন—ওর

বন্দুকে গুলি ভরা আছে। আমি বললাম—ধুত্তোর ওর বন্দুক।

আমি জমাদারকে বললাম তার সিপাই নিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে। জমাদার বলল—ওর বন্দুকে গুলি রয়েছে। সে আমাকে গুলি করবে। আমি তার নাকের ডগায় পিস্তল নাচিয়ে আবার আমার আদেশের পুনরাবৃত্তি করলাম। এবার জমাদার বলল—তার লোকেরা তৈরী হচ্ছে। আমি বললাম—জলদি। বলেই আমি বিদ্রোহীর দিকে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে আমার পুত্র, মেজর রস এবং অন্যরা। আমরা বিদ্রোহীর দিকে আরও দ্রুত পা চালালাম। আমার পুত্র বলে উঠল—বাবা, লোকটি তোমার দিকে বন্দুক নিশানা করছে,—জলদি। আমি বললাম—জন, আমি যদি পড়ে যাই তবে তুমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে খতম করে দিও। পরক্ষণেই মঙ্গল পান্ডে গুলি ছুঁড়ল। তিনজন ছাড়া আর সবাই মাথা নিচু করলেন। মনে হল বিদ্রোহী হঠাৎ তার মতলব পালটেছে। আমার মনে হয় সে বুঝে ফেলেছে যে, পালাবার আর পথ নেই, —এতগুলো অফিসার ঘিরে ধরেছে তাকে। তাছাড়া আরও আসছে। সে তার বন্দুকের নল ঘুরিয়ে নিল নিজের বুকের দিকে। তার পর পায়ের বুড়ো আঙুলে ঘোড়ায় চাপ দিল। নলটা একটু নড়ে গিয়েছিল, বুলেট সরাসরি বুক এফোঁড় ওফোঁড় না-করে বুক, কাঁধ এবং গলার একদিকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে বেরিয়ে গেল। সে সটান মাটিতে পড়ে গেল। পাহারাদার সিপাইরা চেঁচিয়ে উঠল—সে নিজেকেই গুলি করেছে। একজন শিখ সিপাই তার শরীরের তলা থেকে রক্তাক্ত তলোয়ারটা বের করে নিল। আমি দেখতে পাচ্ছি তার ফৌজী জ্যাকেট এবং পোশাক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। আমি জমাদার এবং সিপাইদের বললাম—আগুন নিবিয়ে ফেলতে। তারা তা-ই করল। আমার মনে হল বিদ্রোহী মৃত্যুমুখে। সে কাঁপছে। সুতরাং, ব্রিগেডিয়ার গ্রাণ্টকে বললাম উপস্থিত অফিসারদের থেকে দ্রুত কোর্ট অব ইনকোয়েস্ট বসাতে। ডাঃ হাচিনসনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখে শুনে বললেন, আঘাত গুরুতর হলেও ক্ষত খুব গভীর নয়। তাই চিকিৎসার জন্য শেষ পর্যন্ত ৩৪। নম্বরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল ওকে। ওকে হাতকড়া পরানো হল। একজন সান্ত্রীও মোতায়েন করা হল ওর কাছে।

বাংলোয় ফিরে যাওয়ার আগে আমি ঘোড়ার পিঠে বসে সিপাহিদের মধ্যে একবার চক্কর দিলাম। বললাম—আমি যতদিন অধিনায়ক আছি ততদিন কেউ তোমাদের জাত বা ধর্মে হাত দিতে পারবে না। তারপর গেলাম ৩৪ নম্বরের লোকেদের কাছে। তাদেরও একই কথা বললাম। বললাম—তোমরা ঠিক মত তোমাদের কর্তব্য পালন করনি। মঙ্গল পান্ডেকে এভাবে খুনী বিদ্রোহী হতে দিয়ে তোমরা মোটেই ঠিক কাজ করনি। ওরা একবাক্যে বলে উঠল—সে পাগল। সে বড্ড বেশি ভাং খেয়েছে। আমি জবাব দিলাম—তোমরা কি ওকে ধরে ফেলতে পারতে না? নিরস্ত করতে পারতে না? বাধা দিলে তো গুলি করতে পারতে। কোনও হাতি বা কুকুর পাগল হয়ে গেলে তোমরা কি তাই করতে না? মানুষ যখন ক্ষেপে

গিয়ে খুনী হয়ে ওঠে তখন তার সঙ্গে পাগলা হাতি বা কুকুরের তফাৎ কোথায়? ওরা বলল—তার বন্দুকে গুলি ছিল। আমি বললাম—তোমরা গুলিভরা বন্দুককে ভয় পাও? ওরা চুপ করে রইল। আমি তাদের বললাম—চুপচাপ নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে। ওরা আমার কথা মত সঙ্গে সঙ্গে তা-ই করল।

বারাকপুরে নিজের বাংলোয় বসে মেজর জেনারেল হিয়ার্সে যখন এই চিঠি লিখছেন তার আগেই মঙ্গল পাণ্ডে বিদায় নিয়েছে বারাকপুর থেকে। চিরবিদায়। ৬ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়ই স্থির হয়ে গেছে তার নিয়তি। শেষবারের মতো তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তোমার কী কোনও সাক্ষী আছে? —না। উত্তর দিয়েছিল মঙ্গল পাণ্ডে। আদালত সিদ্ধান্তে পৌঁছাল আসামী দোষী। তার বিরুদ্ধে যে দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে দুই-ই সুপ্রমাণিত। সে বিদ্রোহী। সে খুনী। সুতরাং আদালতের রায়ঃ

৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেণ্টের ৫ নম্বর কোম্পানির ১৪৪৬ নম্বর সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডেকে আদালত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে। —টু সাফার ডেথ, বাই বিয়িং হ্যাঙ্গড বাই দি নেক আনটিল হি বি ডেড। দলিলের তলায সই দিলেন আদালতের সভাপতি ডেপুটি জজ-অ্যাডভোকেট জেনারেল ক্যাপ্টেন জি সি হ্যাচ এবং ইণ্টারপ্রিটার জেমস ভালিংস। 'অ্যাপ্রুভড অ্যাণ্ড কনফার্মড'—তলায় লিখে গেলেন জে বি হিযার্সে, মেজর জেনারেল, কমান্ডিং প্রেসিডেন্সি ডিভিসন।

পরদিন, ৭ এপ্রিল আরও একটি ছোট্ট চিরকুট লিখলেন জেনারেল হিয়ার্সে। সেটি একটি সামরিক নির্দেশ। বক্তব্য : আগামীকাল ৮ এপ্রিল ভোর সাড়ে পাঁচটায় ব্রিগেড প্যারেডে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হবে। যাদের ডিউটি রয়েছে তারা ছাড়া সব সৈন্যকে সেখানে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হল।

এপ্রিলের রাত। বলতে গেলে গোটা ক্যাণ্টনমেণ্টের চোখেই ঘুম নেই। সাহেবরা চিন্তিত। সিপাহিরা ভেতরে ভেতরে আলোড়িত। বাইরে অবশ্য সবাই শান্ত। মাঝ রাত্তির থেকেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। আর ক'টা ঘণ্টা। তার পরই সব শেষ। মঙ্গল পাণ্ডে চলে যাবে।

ভোর হল। কাকডাকা ভোর। তখনও ঠিক রোদ ফোটেনি। বারাকপুর আবছা অন্ধকারে মোড়া। এপ্রিলের ভোরের বাতাসে ফুরফুরে ভাব। সাহেবদের তবু মনে হচ্ছে—বড্ড গরম। সিপাহিরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তাদের যেন আর ঠাণ্ডা গরম বোধ নেই। তারা পরের দৃশ্যের অপেক্ষায়।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন :

বারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডের ঠিক মাঝখানে ফাঁসি মঞ্চ তৈরী করা হল। কামানের আওয়াজ হওয়া মাত্রই সৈন্যরা এসে একটি বর্গক্ষেত্রের তিন বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার একদিকে দাঁড়িয়ে ৭০, ৪৩, ২ এবং মঙ্গল পাণ্ডের নিজের বাহিনী ৩৪ নম্বর। তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে গভর্নর জেনারেলের বডি গার্ড ও ৫৩ নম্বর ইংরেজ বাহিনী। তৃতীয় লাইনটি রচনা করেছে ৮৪ নম্বর ইংরাজ

বাহিনী। তাদের সঙ্গে রয়েছে দুটি ইংরাজ গোলন্দাজ বাহিনী। বডি গার্ডের একাংশ অপরাধীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। তাদের পেছনে পেছনে এলো ইংরাজ সৈন্য পরিবেষ্টিত কোয়ার্টার গার্ডের বন্দী সিপাহীরা। এই ভাবে সকলে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াবার পর বাহিনী চারটিকে ফাঁসি মঞ্চের মুখোমুখি নিয়ে আসা হল।

এ-আয়োজন কি কোনও পাগলা কুকুরকে হত্যার? হিয়ার্সে নিশ্চয় মনে মনে জানেন মত্ত হাতির উপমাটিও মোটে মানায় না। ঘটা করে তিনি যাকে ফাঁসি দিচ্ছেন আসলে তার উপমা সেই সব মানুষেরা ইতিহাসে যাদের বলা হয়—বিদ্রোহী। তাঁরা বীর। জীবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে তাঁরা রুখে দাঁড়াতে জানেন।

ঐতিহাসিক চার্লস বেল লিখছেন—ফাঁসির পর সিপাহিদের আবার মঞ্চের সামনে দিয়ে মার্চ করিয়ে তাদের বারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হল।

মঙ্গল পাণ্ডে, খোলা আকাশের নিচে তোমার ওই রুগ্ণ ঝুলন্ত শরীরটা দেখে ওরা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল, কিংবা চলতে চলতে পা অবশ হয়ে আসছিল,—এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তোমার চোখ খোলা থাকলে তুমি দেখতে পেতে ওদের কারও চোখে জল, কারও চোখে আগুন। শেখ পলটুর মতো স্বার্থপর যারা তাদের দৃষ্টিতেও উদ্বেগের ছায়া। মনে মনে অনেকেই আজ অভিবাদন জানাচ্ছে তোমাকে। তুমি সত্যকারের সাহসী। প্রকৃত বীর। অন্যরা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তুমি কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করনি। অন্য পক্ষ একটি কথাও আদায় করতে পারেনি তোমার কাছ থেকে। তুমি যথার্থ বিদ্রোহী। সর্বলক্ষণে তুমি চিরকালের বিদ্রোহী। পরাজয় যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখনও তুমি আত্মসমর্পণ করনি। তার চেয়ে শ্রেয় জ্ঞান করেছিলে আত্ম-হনন। আমরা জানি, এই সব ইংরাজ অফিসার যারা আজ সযত্নে নিপুণ হাতে তোমার ফাঁসি মঞ্চ সাজিয়েছে তাঁদের অনেকে মনে মনে অভিবাদন করছে তোমাকে। শত্রু হিসাবে তুমি দুর্ধর্ষ। তুমি সম্মানযোগ্য দুশমন।

মঙ্গল পাণ্ডে, তুমি দেশপ্রেমিক ছিলে কিনা, স্বদেশ সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা ছিল কি না, তোমার কোনও জাতীয়তাবোধ ছিল কিনা, তুমি সামন্ততন্ত্রের সেবায়েত কি না, তুমি ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘোরাতে চেয়েছিলে কিনা—সেসব নিয়ে আমরা আজ কোনও তর্ক জুড়ব না। শুধু এইটুকুই বলব তোমার চোখে যে মহাবিদ্রোহের স্বপ্ন ছিল তা দিবা স্বপ্ন ছিল না। ওরা সাড়া দিয়েছিল। তোমার ভাইরা। তোমার সহযোদ্ধারা। সে উপ্যাখ্যান পরে। আপাতত শুনে রাখ বারাকপুর এখনও শান্ত নয়। ওঁরা সেটা জানেন। ফিরিঙ্গীরা। কাল সারাদিন চেষ্টা করেও ওরা বারাকপুরে তোমার কোনও ঘাতক খুঁজে পায়নি। কেউ রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল কলকাতায়।

চার্লস বেল লিখছেন—এ কাজের জন্য জবরদস্তি করে চারজন নিচু জাতের নেটিভকে আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে।

রাজধানী কলকাতায়ও সেদিন অনেক কাণ্ড।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন ঃ

"কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহিগণ আসিতেছে; তাহারা কলিকাতা শহরের সমুদয় ইংরেজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা শহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কী হয় কী হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও দেশীয় খৃীস্টানগণ সর্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে। কালি কথা উঠিল রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলি করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিসের প্রয়োজন হইলেও পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে। কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত,—'হুকুমদার!—অর্থাৎ—হু কাম্ দেয়ার। তাহা হইলেই বলিতে হইত 'রাইয়ত হ্যায়' অর্থাৎ আমি প্রজা। নতুবা ধরিয়া তবে পরীক্ষা করিয়া ছাড়িত।..."

'হুতোম প্যাঁচা' তাঁর অনবদ্য ভাষায় রচনা করে গেছেন সেদিনের কলকাতার বিবরণ :

"...সহরে ক্রমে হুলস্থূল পরে গ্যালো, চুনোগলি ও কসাইটোলার মেটে। ইদ্রুস পিদ্রুস, গমিস্, ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গীরে খাবার লোভে ভলিণ্টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগলো।...লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু'চার বড় বড় ঘরে লুট্তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল লা জারি হলো, যে ছাপাযন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপাযন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর সকলকে একরকম দ্যাখে, ব্রিটিশকুলের সেই চিরপরিচিত ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছুকাল শিকলি পরলেন। বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, যদিও একশ' বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগ্য ম্যাড়া বাঙ্গালিই আচেন—বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি। (পারবেন কিনা তারও বড় সন্দেহ)।...বলতে কি, কেবল আহার ও গুটি কতক বাছালো বাছালো তাঁরা ইংরাজদের স্কেচমাত্রে করে নিয়েচেন। যদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তাহলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতী বাবুরা ফির্তি ফলারে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের

প্যানট্লন ও বিলিতী বদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।..."

ভীতু বাঙালীকে নিয়ে সেদিন বাঙালীর মুখেও নানা রসিকতা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মচরিত' আছে ভয়ে দাঁত কপাটি লেগে যাওয়া সিমলার নানা খবর। তারই মধ্যে সংগী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু মজা করেছেন তিনি। একদিন গিয়ে দেখেন প্যারীমোহন "দেওয়ালের চূণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোটা করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'গরুখোরা বামন মানে'।"

মেদিনীপুরের খবর জানাচ্ছেন রাজনারায়ণ বসু—"আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম ; যখনই সিপাহি আসিবে প্যাণ্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়া ছিলাম। সিপাহিদিগের প্যাণ্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল।..."

সাতান্নর মহাবিদ্রোহে বাঙালী, বিশেষত শিক্ষিত বাঙালীর ভূমিকা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখানে নতুন করে সে-সব বিতর্ক উত্থাপনের সুযোগ নেই। প্রয়োজনও নেই। তবে আমাদের মনে হয় মহাবিদ্রোহে বাঙালী মনোভাব বুঝতে হলে শুধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('দি মিউটিনিস অ্যাণ্ড দি পিপল'—এ হিন্দু) আর কিশোরী চাঁদ মিত্রের বইয়ে ('দি মিউনিটিস, দি গভর্নমেণ্ট এণ্ড দি পিপল') সংকলিত বশ্যতার প্রমাণপত্র কিংবা কিছু বিশিষ্ট বাঙালী আর নানা সংগঠনের আচার আচরণ পর্যালোচনাই বোধহয় যথেষ্ট নয়। সত্য, সাধারণভাবে বলতে গেলে নানা কারণে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালী ছিল এই বিদ্রোহের বিদ্রোহে। কিন্তু সবাই কি চোখ কান বুঁজে ইংরাজের সমর্থক। শুধু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেন, খুঁটিয়া দেখা দরকার কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরী চাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যদের মতামত। গিরিশচন্দ্র বিদ্রোহের সময়ে কলকাতার সাহেবদের উম্মত্ততাকে জর্জরিত করেছেন ব্যংগ আর বিদ্রূপে। হরিশ্চন্দ্র সোজাসুজি ঘোষণা করেছেন—"এই বিদ্রোহ এখন আর সিপাহিদের মধ্যে সীমাবন্ধ নয়। এটা এখন ব্যাপক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। সিপাহিরা তাদের জীবনের সর্ব স্বার্থ এতে উৎসর্গ করেছে এবং দেশবাসীরাও তাদের মহান জাতীয় আদর্শরূপ পবিত্র ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ শহীদ রূপে গণ্য করছে।..."

গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়া দরকার সমকালের সাহিত্যও। একজন বাঙালী লেখকই ('১৮৫৭ ও বাংলা দেশ'—সুকুমার মিত্র) দেখিয়েছেন এই মহা বিদ্রোহ নিয়ে কয়েক দশকের মধ্যে বেশ কিছু গল্প উপন্যাস নাটক রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। সব রচনাই রাজভক্তিতে আপ্লুত নয়। আর একজন গবেষক দেখিয়েছেন বিদ্রোহের স্বপ্ন বাঙালীকে পেয়ে বসেছিল সাতান্নর আগেই। ('উনিশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকর—পল্লব সেনগুপ্ত)। গবেষক বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছেন দুটি গল্প। একটির লেখক—কৈলাসচন্দ্র দত্ত,

অন্যটির—শশীচন্দ্র দত্ত। প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৩৫ ও ১৮৪৫ সন। ওঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন অবশ্য ইংরাজীতে। তবে স্বদেশী স্বপ্ন। সশস্ত্র বিদ্রোহের স্বপ্ন। ওঁরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন—ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর রসিকতা অতএব বাঙালীর একমাত্র মনের খবর নয়। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ (ঝান্সীর রানী), প্রসন্নময়ী দেবীর কবিতা (বীর নারী লক্ষ্মীবাঈ)—সবই কিন্তু সঞ্চিত রয়েছে বাঙালীর ভান্ডারে। সবই আমাদের ঐতিহ্য। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র যে লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে চেয়েছিলেন সেই সংবাদটিও। কে জানে, মাইকেলের কাব্যিক বিদ্রোহেও বুঝি কালের ছায়া।

সে সব প্রসঙ্গ থাক। কলকাতায় ফিরি। বাঙালীটোলার খবর কিছু মিলেছে শিবনাথ শাস্ত্রী আর হুতোমের রচনায়। সাহেব পাড়ার পরিস্থিতি আরও হৃদয়-বিদারক। থেকে থেকেই গুজব—পাণ্ডেরা আসছে। শহরের গোরা আর বিবিরা ভেবে পাচ্ছেন না তাঁরা কী করবেন। ভয় শুধু বারাকপুরের পাণ্ডেদের নিয়েই নয়, ভয় সবখানেই। যেদিকে তাঁরা তাকান সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেও ভয়। গার্ডেনরীচে অযোধ্যার ভূতপূর্ব নবাবের হাজার হাজার ভূতপূর্ব সিপাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা কি ভয়ের নয়? টালিগঞ্জে রয়েছে মহীশুরের নবাবদের চেলারা। একদিন তো নবাব বাড়ির লোকেরা সাদী উপলক্ষে বাজী ফাটাতে গিয়ে বিপত্তিই ঘটিয়েছিলেন। সাহেব মেমদের সে কী হৃদকম্প! ওদিকে দমদমে ঘাপটি মেরে বসে আছে সিন্ধিয়ার আমীরের লোকজন। তাছাড়া, হাজার হোক কলকাতা কালোদের শহর। কে জানে, তারা কখন করাল মূর্তি ধারণ করছে। একজন মেম তো দেখতেই পাচ্ছেন তাঁর আয়ার মতিগতি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। সে কোনও কথাই শুনতে চায় না। সব সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজে ব্যস্ত। আয়া নয় তো, যেন নাচনেওয়ালী। কিন্তু বললে বলে—মিছেই রাগারাগি করছেন মেম সাহেব, আপনাদের দিন তো ফুরিয়ে এল। এবার আমাদের রাজত্ব।

তারই মধ্যে রাজভবনে ফাইলে মুখ গুঁজে আছেন ক্যানিং। বড় ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নিজেও পার্লামেন্টে বেশ নাম করেছিলেন। সুশিক্ষিত মানুষ। ইটন এবং অক্সফোর্ডে পড়েছেন। চরিত্র শান্ত এবং ধীর। বয়স চল্লিশের কোঠায়। সুদর্শন পুরুষ। সঙ্গে সুদর্শনা স্ত্রী শার্লট। লেডি ক্যানিংয়ের বয়স তখন বড়জোর আটত্রিশ। মাত্র দু'বছর হল (১৮৫৫) কলকাতায় এসেছেন ওঁরা। ক্যানিংয়ের খুব ইচ্ছে ছিল না। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন। লোকে বলে শার্লট স্বামীকে আর এক রূপসীর নজরের আড়াল করতে চেয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা নাকি ক্রমেই আরও বেশি ঝুঁকছিলেন লর্ডের দিকে।

সেসব নিয়ে এখন ভাববার সময় নেই। আকাশে মেঘ। ঝড়ের পূর্বাভাস। ক্যানিংয়ের মাথায় শুধু তাঁর পূর্বসূরী লর্ড ডালহৌসি নয়, যেন ক্লাইভ থেকে শুরু করে ছোট-বড়-মাঝারি সব ইংরাজ রাজপুরুষদের সমুদয় অপকর্মের বোঝা।

তাঁর মাথা তবু অবিশ্বাস্য শান্ত। তাঁর বিরুদ্ধে থেকে থেকেই মুর্দাবাদ ধ্বনি তুলছেন কলকাতার ইংরাজরা, সভা করছেন, তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রানীর কাছে দরখাস্ত করছেন, ব্যঙ্গ করে শিরোপা চাপাচ্ছেন, এমন কি কিছু কিছু সামরিক অধিনায়কও জানিয়ে দিচ্ছেন জি-জি'র সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধের কথা। ক্যানিং তবু অনড়, অটল। তাঁর মধ্যে উত্তেজনার ছিঁটেফোটাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ভোরে উঠে তিনি কাজে বসেন। ব্রেকফাস্ট সেরে আবার কাজের টেবিলে। সন্ধ্যায় রাজভবনের বাগানে কয়েক চক্কর হাঁটেন। তারপর আবার নিশুতি রাত পর্যন্ত কাজ।

শহরের চলতি আবহাওয়ার সঙ্গে কোনও মিল নেই লেডি ক্যানিংয়ের চাল চলনেরও। বিকালে নিয়মিত বগি হাঁকিয়ে তিনি গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বের হচ্ছেন। সঙ্গে বড়জোর দু'চার জন। গভর্নমেণ্ট হাউসে যথারীতি ভোজের আসরেরও আয়োজন করছেন তিনি। সেখানে নানা দৃশ্য। 'আই হোপ উই স্যাল অ্যারাইজ সেইফলি!' খাওয়ার টেবিলে বসতে বসতে মন্তব্য করলেন নিমন্ত্রিত এক মেম সাহেব। তাঁর ধারণা তিনি নির্বিঘ্নে খাওয়া শেষ করতে পারবেন না। তার আগেই পাণ্ডেরা এসে হানা দেবে গভর্নমেণ্ট হাউসে। ভোজের আসরে অনেক অতিথিই সশস্ত্র। তাদের আর দোষ দিয়ে লাভ কী। পথে ঘাটে প্রায় সব ইংরাজই সেদিন সশস্ত্র। সেক্রেটারিরা তখন কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে আপিস করছেন। কাউন্সিলের মেম্বাররাও যেন এক একজন ভয়ের বিজ্ঞাপন। তাঁদের দরজায় দরজায় ব্যারিকেড, কোমরে পিস্তল। বিছানা ছেড়ে ইদানীং নাকি তাঁরা সোফায় ঘুমোচ্ছেন। এমন কি রাজ্যের গভর্নর হ্যালিডে সাহেবও তখন আর বেলভেডিয়ারে থাকা নিরাপদ জ্ঞান করছেন না। ক্যানিংয়ের কাছাকাছি থাকার ওজর দেখিয়ে তিনি উঠে এসেছেন কলকাতায়। সুতরাং টম-ডিক-হ্যারির আর দোষ কী! রাজভবনের ভোজসভায় এমন কি মহিলারাও সশস্ত্র। অস্ত্রও তখন বিবিদের আর এক গহনা। ক্যানিং লিখেছেন—"জীবনে একসঙ্গে এত তলোয়ারধারী বৃদ্ধা রমণীর সমাবেশ আর কখনও দেখিনি।" এক মেমের ক্ষোভ—তাঁকে স্বামীর সঙ্গে বাইরে যেতে দেওয়া হল না। স্বামী ফৌজে কাজ করেন। তাঁকে অন্যত্র ছুটতে হয়েছে। মেয়েটি গর্ব করে বলছে—আমি সামান্য রমণী নই, আমার পিস্তল রয়েছে। এবং আমি জানি কি করে তা ব্যবহার করতে হয়।

অথচ স্রেফ গুজব শুনে ওঁরা কী কাণ্ডটাই না করলেন সেদিন। সবাই ছুটছেন কেল্লার দিকে। যে যেভাবে পারেন। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পৌঁছাতে হবে সেখানে। কেননা, পাণ্ডেরা আসছে। কেউ কেউ পরিবার পরিজন নিয়ে ছুটলেন নদীর ঘাটে। জাহাজে যদি ঠাঁই মিলে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন—"আধ ডজন মানুষ ইচ্ছে করলেই সেদিন কলকাতার বারো আনা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারত। এবং গোটা কয়েক লণ্ডনী চোর যদি আজ এখানে থাকত তবে চৌরঙ্গীর আশপাশ থেকেই তারা বিস্তর কামাতে পারত আজ।"

সত্যিই, অবিশ্বাস্য সেসব দৃশ্য। আধবয়সী বাবা গেছেন রাজভবনে নিমন্ত্রণ রাখতে। বাড়িতে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে তাঁর সোমত্ত মেয়ে। কাঁদছে এমন নাচ আর ভোজটা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে নয়, বাবা ফিরবার আগেই যদি পান্ডেরা এসে পড়ে। এক ইংরাজ মহিলা সে-ভয়েই অনেক বলে কয়ে দুই গোরা সৈন্যকে আদর আপ্যায়ন করে ধরে এনেছিলেন নিজের বাড়িতে। রাতটা যদি ওরা পাহারা দেয় তবে নিশ্চিন্ত। অবশ্য রাত্তিরে তিনি নাকি বুঝেছিলেন মনের পান্ডেরা যত ভয়ের, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ের ঘরের টমিরা। বিশেষ করে বাড়িটা যখন ফাঁকা, এবং সৈন্য দু'জন বলতে গেলে অপরিচিত। তদুপরি নেশাগ্রস্ত।

এসব দেখে শুনে ক্যানিংয়ের মন্তব্য: "ইংরাজদের আচার আচরণ দেখে আমি সত্যিই লজ্জিত। 'হুইচ মেক মি অ্যাসেমড ফর ইংলিশমেন'!"

"তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঢ়—কাশীর বিশেশ্বরের পান্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারদের বাড়ির গিন্নি স্বপ্নে দেখেছেন ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না। দুই একজন ভট্টাচায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন" —বিদ্রোহের সময়কার কলকাতার আবহাওয়া-সংবাদ বলছেন হুতোম। তাঁর বলার ভঙ্গীটি তির্যক। কিন্তু এই বিদ্রূপের মধ্যেও বোধহয় লুকিয়ে আছে কিছু সত্য। এপাড়ায় ওপাড়ায় কিছু না কিছু মানুষ সত্যিই ভাবছিলেন—ইংরাজের রাজত্ব গেল বলে। সে সব অবশ্য ক' সপ্তাহ পরের কথা। কলকাতার উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে ক'সপ্তাহ পরে। আমরা এতক্ষণ ধরে কলকাতার যে চেহারা দেখলাম সে মে-জুন মাসের। তাই বলে, মঙ্গল পান্ডে, এপ্রিলের ৮ তারিখে তোমার ফাঁসির খবর কি কলকাতায় পেঁছায়নি? নিশ্চয়ই পাড়ায় পাড়ায় রটে গিয়েছিল সে-খবর। শুধু সিপাহিদের মধ্যে কেন, চৌরঙ্গীর সাহেব পাড়ায়, আমাদের বাঙালীটোলায় —সর্বত্র। হয়তো সাহেব মেমরা আনন্দে উৎফুল্ল, হয়তো আমাদের পল্লীর রাজভক্ত বাবুরাও কিছু পরিমাণে আশ্বস্ত। তবে ধরে নিতে অসুবিধা নেই এ শহরের অধিকাংশ মানুষই সেদিন মৌন। তাই বলে মনে করার কোনও কারণ নেই তোমার ফাঁসি তাঁরা অনুমোদন করেছিলেন। চুপ করে থাকাটা, তুমি নিশ্চয়ই জান, সব সময় সম্মতির লক্ষণ নয়। খবর শুনে একজন বাঙালী কী লিখেছিলেন জান? হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (হিন্দু প্যাট্রিয়ট) লিখেছিলেন—'সব টোটাগুলি যদি সিপাহিদের চোখের সামনে পুড়িয়েও ফেলা হয় তা হলেও তাদের অসন্তুষ্টি দূর হবে না।" হরিশচন্দ্র একথা লিখেছিলেন এপ্রিলের ৯ তারিখে। তোমার ফাঁসির পরদিন।

হরিশচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

মঙ্গল পান্ডেকে বিদায় করে বারাকপুরের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবার পড়লেন কোয়ার্টার গার্ডের নেটিভ অফিসার জমাদার ঈশ্বরী পান্ডেকে নিয়ে। তার আগে জেনারেল হিয়ার্সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অনেক কাজ করেছেন। শেখ পলটুকে রাতারাতি হাবিলদার করা হয়েছে। কারণ সে নিমকহারাম নয়। সে দু'জন সাহেবের জীবন

বাঁচিয়েছে। পেছন থেকে সে যদি মঙ্গল পান্ডেকে ধরে না রাখত তাহলে কী হত বলা যায় না। পলটু বলছিল—সে আরও অস্থির হয়ে উঠেছিল একজন সাহেবের তলোয়ার ভেঙে গেছে দেখেই। ৯ এপ্রিল আবার আদালত বসল। উদ্দেশ্য বীরত্বের জন্য শেখ পলটু ওরফে শেখ ফালতুকে (সাহেবরা যে বানান লিখেছেন তা মেনে নিলে ওকে দ্বিতীয় নামে ডাকাই ঠিক) আরও পুরস্কৃত করা। হিউসন সাহেব বলেছিলেন তিনি পলটুকে পাঁচ বছর ধরে চেনেন। সে বেশ ভাল লোক। স্বভাব চরিত্র চমৎকার। হিউসনের বিবিও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি বললেন—বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি সব কিছুই দেখেছেন। মঙ্গল পান্ডের কান্ডকারখানা দেখে তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একজন লোক পেছন থেকে মঙ্গল পান্ডেকে জড়িয়ে ধরল। সে এগিয়ে না-গেলে তাঁর স্বামী নির্ঘাৎ মারা পড়তেন। স্থির হয়েছিল ফালতুকে 'অর্ডার অব মেরিট' দেওয়া হবে। অবশ্য 'থার্ড ক্লাস অর্ডার অব মেরিট।' কিন্তু গভর্নর জেনারেল সে প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন। বললেন—বাড়াবাড়ি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আহত ইংরাজ অফিসার দু'জনকে পুরস্কৃত করার চিন্তাও তাঁর কাছে অবান্তর।

ঘটনার পর দিন, অর্থাৎ মার্চের ৩০ তারিখেই বারাকপুরে এক তদন্ত-সভা বসানো হয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য। চারজন লিখিত বিবৃতি পেশ করে সে সভায়। তারা হল শেখ ফালতু, জমাদার গণেশলাল, হাবিলদার মোক্তার প্রসাদ পান্ডে এবং ড্রামার জন লুইস। বলতে গেলে তাদের প্রাথমিক বিবরণের ভিত্তিতেই মঙ্গল পান্ডের কোর্ট মার্শাল। জেনারেল হিয়ার্সে সেখানেই থামলেন না। মঞ্চ থেকে মঙ্গল পান্ডেকে সরিয়ে দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন জমাদার ঈশ্বরী পান্ডেকে। তার বিচার শুরু হয় এপ্রিলের ১০ তারিখে। বিচারে প্রমাণ হয়ে গেল সে ছিল মঙ্গল পান্ডের পক্ষে। তাই মঙ্গল পান্ডেকে সে গ্রেপ্তার করেনি। সাহেবদের নির্দেশকে অবহেলা করেছে সে। কোনও সিপাই মঙ্গল পান্ডেকে নিরস্ত করতে এগিয়ে যায়নি তারই জন্য। বরং সিপাইদেরও প্রকারান্তরে অনুপ্রাণিত করেছে সে সাহেবদের নিগ্রহ করার জন্য। তার চোখের সামনেই কি কিছু সিপাই আহত দু'জন অফিসারকে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করেনি? আদালতে সাব্যস্ত হল জমাদার ঈশ্বরী পান্ডেও দোষী। ওঁরা রায় দিলেন তারও প্রাপ্য মৃত্যুদণ্ড। রায় ঘোষিত হয় ১৩ এপ্রিল। আর, ঈশ্বরী পান্ডেকে ফাঁসি মঞ্চে তোলা হয় ২১ এপ্রিল। মাঝখানে বেশ ক'দিনের প্রতীক্ষা। দ্বিতীয় পান্ডের গৌরব লাভ করে ঈশ্বরী, রায় বের হবার আট দিন পরে। মঙ্গল পান্ডে, তুমি হয়তো ভাবছ এত দেরী কেন? তোমাকে তো ওরা বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন বধ্যভূমিতে। হয়তো সে তোমার গৌরব বাড়াবার জন্যই। তুমি প্রথম পান্ডে। তবে এখন শোনা যাচ্ছে ওঁরা বেআইনি কাজ করেছিলেন। জব্বলপুরে সামরিক মিউজিয়ামে যে সব কাগজপত্র রয়েছে তা থেকে সম্প্রতি নাকি জানা গিয়েছে ফাঁসির সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ভাবে অনুমোদিত হওয়ার আগেই

জেনারেল হিয়ার্সে তোমার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন। আসলে তোমার ফাঁসি হওয়ার কথা ৮ এপ্রিল নয় পরের কোনও তারিখে। ঈশ্বরীর রায় নিয়ে, আমরা দেখছি, ক্রমাগত ক'দিন ধরে বারাকপুর কলকাতা আর সিমলার মধ্যে নির্দেশ প্রতিনির্দেশ চালাচালি হচ্ছে। কখনও তারে। টেলিগ্রামের জবাবে টেলিগ্রাম। তবে জেনে রেখো দ্বিতীয় পাণ্ডে ঈশ্বরী পাণ্ডেও তোমার যোগ্য সহযোদ্ধা। হিয়ার্সে লিখেছেন—সে শেষ সময়ে স্বীকার করে, এসবে জড়িয়ে পড়ে সে ভুল করেছে। তার মধ্যে অনুশোচনা দেখা গিয়েছিল। অন্যদের সে পরামর্শ দিয়েছিল এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে। হতে পারে। যে মানুষ মরতে চলেছে তার পক্ষে সবই সম্ভব। সবাই মঙ্গল পাণ্ডে নয়। হয়তো দ্বিতীয় পাণ্ডে ঈশ্বরী কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তও ছিল। তবু সে ক্ষমার যোগ্য। তারও শহীদের সম্মানই প্রাপ্য। কেন না, ফাঁসির মঞ্চেও ঈশ্বরী পাণ্ডের ব্যবহার ছিল যথার্থ পুরুষের মতো। জেনারেল হিয়ার্সে কাজ শেষ করে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন ওপরওয়ালাদের কাছে। তাঁর শেষ বাক্যটি শোনার মতো। তিনি লিখছেন—"দি প্রিজনারস বিয়ারিং অ্যান্ড বিহেভিয়ার আপন দি স্ক্যাফোল্ড ওয়ার ম্যানলি অ্যান্ড বিকামিং দি সোলেম পজিসন অব ওয়ান অ্যাবাউট টু বি লানচ্ড ইনটু ইটারনিটি।"

বারাকপুরে অতঃপর ওঁরা পড়লেন গোটা ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রিকে নিয়ে। তার আগেই বহরমপুরের অবাধ্য ১৯ নম্বর বাহিনীর বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে। ২৯ মারচ মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ। ৩০ মার্চ ১৯ নম্বরকে মার্চ করিয়ে নিয়ে আসা হল বারাকপুর থেকে আট মাইল দূরে—বারাসতে। ওরা তখনও জানে না এতখানি পথ হাঁটিয়ে কেন বারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের। তবে বারাকপু র আগের দিন কী ঘটে গেছে তা জানতে বাকি রইল না কারও। ৩৪-এর কিছু সিপাহি, অর্থাৎ মঙ্গল পাণ্ডের কিছু সহযোগী নিঃশব্দে উঁকি দিল তাদের ছাউনিতে। বারাকপুর থেকে তারা হেঁটে আসছে। তাদের প্রস্তাব—তোমরাও হাত মিলাও। তোমরাও বিদ্রোহ কর। আজই রাত্রে এখানকার সব ব্রিটিশ অফিসারদের খতম করে চলো বারাকপুর। সময় নেই। সেখানে আমরা ৩৪ নম্বর তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব। বাংলো জ্বালাব। গোরা সৈন্যদের কচুকাটা করব। কামানগুলি দখল করে নেব। তারপর সবাই মিলে মার্চ করব কলকাতার দিকে। ওরা ঘরপোড়া গরু। ফেব্রুয়ারির সেই রাত্তিরের স্মৃতি তখনও ওদের মনে জ্বলজ্বলে। সে দিন ওদের মনে ছিল দ্বিধা। এখন রীতিমত জড়তা। ওরা ৩৪ নম্বরের প্রস্তাবে রাজী হল না। ১৯ নম্বর আর কোনও ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

পরদিন সকালে ১৯ নম্বরকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হল বারাকপুরে। বারাকপুরের চোখে মুখে দুশ্চিন্তা। না জানি এবার কী হয়। তবে লাটবাগানের লোকেরা এখন অনেকটা আশ্বস্ত। সেই ভয়ের ভাবটা আর নেই। কারণ, হিয়ার্সে ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। ৩০ মার্চ সকালেই চুঁচুড়া থেকে ছুটে এসেছে হার ম্যাজেস্টির ৮৪ নম্বর বাহিনীর গোরা সৈন্যরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দমদমের ৫৩

নম্বরের টমিরা। এছাড়া এসেছে গভর্নর জেনারেলের বডি গার্ডদের একাংশ। তহবিলে রয়েছে আরও দুই ব্যাটেলিয়ান গোরা সৈন্য। তদুপরি আছে কলকাতা থেকে আনা একটি বিশ্বস্ত নেটিভ বাহিনী। বড়লাটের বাগানে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সেদিন তাঁবু আর তাঁবু। চারদিকে শিস দিতে দিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমুদে সাদা সেপাই। তাদের আসল কাজ একটু পরেই।

মার্চের সংক্রান্তি। বহরমপুর থেকে ডেকে আনা ১৯ নম্বর প্যারেড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে। চারপাশে ঘিরে গোরা সৈন্যরা। হঠাৎ বজ্রাঘাত। নিজেদের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ওরা। হিয়ার্সে বলছেন—সরকার বাহাদুর তাদের বাহিনী ভেঙে দিচ্ছেন। তাদের ছুটি। তারা এখন দেশে ফিরে যেতে পারে। ইচ্ছে করলে পথে ধর্ম-কর্মও করে যেতে পারে। তারা অনুশোচনা করেছে। দু'-একদিন পাগলামি করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের সম্বিৎ ফিরে এসেছে। গত কয়েক সপ্তাহ তারা বেশ ভাল আচরণ করেছে। ঠিক যেমনটি করা উচিত। সুতরাং, সরকার বাহাদুর তোমাদের জবাব দিয়ে দিলেও তোমাদের কোনও শাস্তি দেবেন না। তোমাদের ইউনিফর্ম তোমাদের গায়েই থাকবে। তোমরা প্রাপ্য মাইনে পাবে। রাহাখরচও কিছু দেওয়া হবে।

কিছু করার নেই। সরকারী হুকুম। ওরা অস্ত্র ত্যাগ করল। পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে সেদিনই বারাকপুর ত্যাগ করল। একদল গোরা সৈন্য তাদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে এলো। বারাকপুর ছাড়ার আগে জেনারেল হিয়ার্সের নামে দু'একবার জয়ধ্বনিও তুলল ওরা।

আব মঙ্গল পাণ্ডের ৩৪ নম্বর বাহিনী? বিস্তারিত তদন্ত শুরু হল তাদের সম্পর্কে। জানা গেল—বাহিনী বিষাক্ত। সিপাহিরা অনেকেই মঙ্গল পাণ্ডের অনুরক্ত। কিছু দিশি সিপাইও নানা গোপন খবর তুলে দিল কর্তৃপক্ষের হাতে। যথাঃ প্যারেড গ্রাউন্ডে রাতের সেই গোপন মিটিংয়ের খবর। আরও নানা কথা। ইউরোপীয়ান অফিসারদেরও মতামত নেওয়া হল। কেউ বললেন—ওরা ক্রমেই দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। অফিসারদের দেখলে এখন আর উঠে স্যালুট করে না। আর একজন বললেন—ওরা এখনও হুকুম তামিল করছে বটে, কিন্তু গোমড়া মুখে, রাগত ভাবে। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হল এই বাহিনীকে নিয়ে আপনি কি কোনও লড়াইযে যেতে সম্মত?—সারটেনলি নট। উত্তর দিলেন অফিসার। অবশ্য অন্য অফিসাররা সবাই তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। একজন বললেন—কই, আমি তো ওদের মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ কিছু দেখছি না। —আপনি কি ওদের অধিনায়ক হিসাবে কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে রাজী? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—নিশ্চয়ই। তবু সব দেখে শুনে অনেক ভেবেচিন্তে ওঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন—৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি বাহিনীকে ভেঙে দেওয়াই সঙ্গত। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এপ্রিলের ১৭ তারিখে। তারপর প্রস্তুতি। হিসাব নিকাশ। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে লেখালেখি।

২১ এপ্রিল হিসাব করে দেখা গেল বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১০৮৯ জন।

তাদের মধ্যে ৭৪ জন শিখ, ২০০ মুসলমান। বাদ বাকি সবাই হিন্দু। হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বাঁধাবার জন্য একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা চালাচ্ছিলেন ওরা। আদালত সিদ্ধান্তে পেঁছেছিল মুসলমানরা অনেক বশ্য, বিদ্রোহের প্রবণতা হিন্দুদের মধ্যেই বেশি। ক্যানিং বললেন—এক যাত্রায় পৃথক ফল শ্রেয় নয়। শাস্তি দিতে হয় সবাইকে দিতে হবে। তবে হ্যাঁ, মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের দিনে যারা অন্য রকম আচরণ দেখিয়েছে তাদের বাদ দেওয়া দরকার। গভর্নর জেনারেলের মতে তাদের সংখ্যা ৩ থেকে ৮ জন। এদের রেখে ফৌজ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন তিনি। স্থির হল ২৯ মার্চ যারা গোরা অফিসারদের নিগ্রহ করেছিল তাদেরও অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। অন্যদের মতো তাদেরকে জবাব দিয়ে দিতে হবে। সরকার ৩৪ নম্বরের হাত থেকে অব্যাহতি চান।

মঙ্গল পাণ্ডের বাহিনী ৩৪ নম্বরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভেঙে দেওয়া হয় মে মাসের ৬ তারিখ। আবার সেই গোরা সৈন্য বেষ্টনী। তোপ ভরা কামানের শাসানি। তারই মধ্যে নিরস্ত্র করা হল ৩৪ নম্বরের সিপাহিদের। বহরমপুরের ১৯ নম্বরের মতো কোনও খাতির দেখানো হল না। ওদের প্রত্যেকের গা থেকে ইউনিফর্ম খুলে নেওয়া হল। ঘোষণা করা হল অতঃপর কোম্পানির বাহিনীতে ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি বাহিনী লুপ্ত। দুঃস্বপ্নের মতো সরকার বাহাদুর ভুলতে চান তার স্মৃতি। তারপর আগে পিছে গোরা সৈন্য দিয়ে ওদের বের করে দেওয়া হল ক্যান্টনমেন্টের বাইরে। ফৌজের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক তখন শুধু মাথার টুপিটি। সরকার ন্যায়পরায়ণ। ফৌজী টুপি হলেও ওদের কাছ থেকে তার দাম কেটে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং বলে দেওয়া হল ওগুলো তোমাদের সম্পত্তি। তোমরা রাখতে পার। ওরা বারাকপুরকে বিদায় জানিয়ে হাজির হল নদীর ঘাটে।

মঙ্গল পাণ্ডে, তুমি বুঝতে পারছ, এই শাস্তি কিসের প্রমাণ। ওরা হয়তো সেদিন তোমার সঙ্গে সেভাবে হাত মেলায়নি, কিন্তু ওদের মন ছিল তোমারই সঙ্গে। সব মানুষ সব সময় সব পারে না। ওরাও সেদিন পারেনি তোমার মতো বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াতে। অথচ ওরাও কিন্তু ভীরু ছিল না। ওরাও চেষ্টা করেছিল একটা কিছু করতে। আজ হার মেনে ফিরে গেল—এই যা।

ওদের পাঠানো হয়েছিল দুই কোম্পানি গোরা সৈন্যের পাহারায়। তারা যাবে ফলতা ঘাট অবধি। সেখানে একটি স্টীমার অপেক্ষা করে আছে। তাতে ওদের মালপত্র থাকবে। সে মাল হাতে পাবে ওরা চুঁচুড়া পেঁছে। ব্যবস্থা এইরকম। নদীর ঘাটে পেঁছেই ওরা এক কাণ্ড করল। মাথার টুপি খুলে ফেলে মাটিতে ছুঁড়ে দিল। তারপর ঘৃণা আর ক্রোধে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল সেগুলোকে। পরাজয়েও ওরা বিদ্রোহী।

হিয়ার্সে তাদের এই দুর্বিনীত আচরণের কথা শুনলেন। কিন্তু ঘটনাটাকে অমল দিলেন না। তাঁর কাজ তিনি করেছেন। ভালয় ভালয় আপদ বিদায় করেছেন।

সময় নিয়েছেন মাত্র দু'ঘণ্টা, সকাল পাঁচটা থেকে সাতটা। আর কী করতে পারেন তিনি? বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। ক্যাণ্টনমেণ্টের রোদের তেজ অনেক কমে গেছে। সূর্য শ্রীরামপুরের আকাশে। নদীর দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। মেজর জেনারেল হিয়ার্সে তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে বসলেন। একটা বার্তা পাঠানো দরকার। ওপরওয়ালাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার তাঁর সাফল্যের কথা। কাগজ টেনে নিয়ে তিনি একটা টেলিগ্রামের খসড়া লিখলেন। আবার পড়লেন। হ্যাঁ এই যথেষ্ট। দু ছত্রের একটি বার্তা। হিয়ার্সে লিখেছেন—"দি থার্টিফোর্থ রেজিমেণ্ট নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি হ্যাজ বিন ডিসব্যাণ্ডেড। অল কোয়ায়েট: টাইম অন প্যারেড।" পরদিন সকালে, অর্থাৎ ৭ মে তিনি বারাকপুর থেকে সব ইংরাজ বাহিনীকে ফেরত পাঠালেন তাদের নিজ নিজ আড্ডায়।। কোনও দল যাত্রা করল দমদমের দিকে, কোনও দল চুঁচুড়ার দিকে, কেউ বা বালিগঞ্জের দিকে।

সব শুনে হাঁক ছাড়লেন লেডি ক্যানিং। কলকাতার রাজভবনে বসে তিনি রোজনামচায় লিখলেন—বিপদ কেটে গেছে.—"অল আওয়ার ট্রাবল্স আর ওভার।"

মঙ্গল পাণ্ডে, জেনারেল হিয়ার্সে সেদিন জানেন না, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে কী তিনি করেছেন। গোটা উত্তর ভারতের সর্বত্র গাঁয়ে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসন্তোষের বিষবাষ্প। অথবা আবীরের মতো গ্রীষ্মের বাতাসে উড়িয়ে দিলেন মুঠো মুঠো বারুদ। ৩৪ নম্বর বাহিনীর তোমার বন্ধুরা কোন সংকল্প নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে জেনারেল হিয়ার্সে তা জানেন না। জানেন না, বারাকপুর থেকে যে ভারতের দিকে ওরা হাঁটছে সেখানে ততক্ষণে হাজার হাজার পাণ্ডে তৈয়ার। চারদিন পরেই বিস্ফোরণ। ১০ মে—মীরাট। ১১ মে—দিল্লি। হ্যাঁ, দিল্লিতেও তুমি।

উপসংহারে সেই কাহিনী।

মীরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লি পেঁছে গেছে।

মুঘলদের ভূতপূর্ব রাজধানীতেও বিদ্রোহের আগুন। ক্যাপ্টেন রবার্ট টাইটলার ৩৮ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি বাহিনীকে একটি জরুরী বার্তা পড়ে শোনাচ্ছেন। বার্তার বিষয় বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি। হঠাৎ কী যেন একটা বেশ জোরে এসে আঘাত করল তাঁকে। ক্যাপ্টেন টাইটলার এদিক ওদিক তাকালেন। কিছু চোখে পড়ল না। কিন্তু যে চোখে পড়ল তা দেখে তিনি স্তম্ভিত। ৩৮ নম্বরের সিপাহিরা মঙ্গল পাণ্ডের খবর শুনে উত্তেজিত। রাগে তারা গজগজ করছে, মাটিতে পা আছড়াচ্ছে। তিনি লিখছেন—জীবনে আর কখনও আমি এমন দৃশ্য দেখিনি। তিনি বোধহয় জানতেন না ৩৮ নম্বরের রক্তেও বিদ্রোহের বীজ সুপ্ত ছিল। কার্জন লিখেছেন, ১৮৫২ সনে বারাকপুরে যাদের নিয়ে ডালহৌসি বিদ্রোহের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন একবার সে-এই ৩৮ নম্বর। সাহেব অফিসারদের জন্য আরও কিছু অভাবিত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল তখনও।

লড়াই সেদিন দিল্লির কাশ্মীরী গেটে। মীরাটের বিদ্রোহীদের তুমুল লড়াই

চলছে সেখানে। ৩৮ নম্বরকে ইংরাজ অফিসার হুকুম দিলেন—গুলি চালাতে। ওরা একসঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি চালাল আকাশকে লক্ষ করে। তারপর খোলা বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজেদের শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের ওপর। সঙ্গে তাদের মীরাটের সওয়াররা। মঙ্গল পাণ্ডে, তুমি টোটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে ; এখন, তাকিয়ে দেখ, বিদ্রোহীরা সেই টোটাই দিব্যি ব্যবহার করছে দুশমনদের বিরুদ্ধে !

নীল আগুন
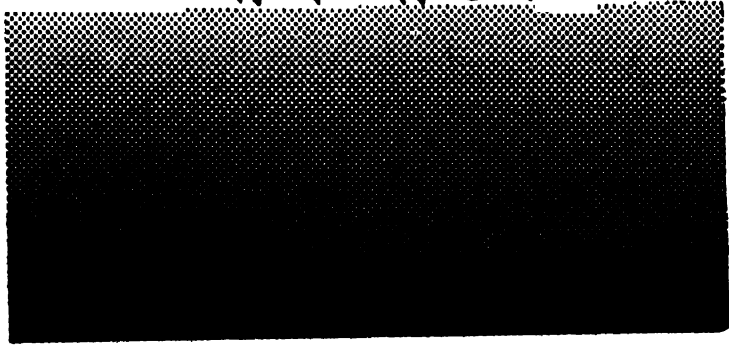
খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলেও বোধ হয় আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না এই বাড়িটিকে। হয়তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অনেক অনেক দিন আগে নয়তো—মরে ভূত, কেন না, বাড়িটি নীলকুঠি।

অনেক নীলকুঠি পুড়েছে। নীল আকাশে থেকে থেকেই লাল আগুন। কখনও বাংলার বাইরে, কখনও বাংলায়। সাতান্নর মহাবিদ্রোহে সিপাহীর চোখের আগুনে অনেক নীলকুঠিও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আলিগড় জেলায় তিনটি। রোহিলখণ্ডে বদায়ুন জেলায় বেশ কয়েকটি। আজমগড়ে একটি কুঠিও নাকি অক্ষত ছিল না। সাহাবাদেও সব কুঠি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। শোন নদীর দুই ধারে যত নীলকুঠি সব প্রাণহীন শব, নতুন চাষের জন্য নীলের বীজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না ওই তল্লাটে। মুর নামক এক বিচারপতি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিলেন বিদ্রোহী নায়ক উদ্ধান্ত সিংকে। বিদ্রোহীদের তাড়া খেয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন মির্জাপুরের এক নীলকুঠিতে। ফলে কুঠি ছারখার। মুর সাহেবের কাটা মুণ্ডু নিয়ে বিদ্রোহীরা ঘরে ফিরল। মুণ্ডুটি নাকি উপহার দেওয়া হয়েছিল উদ্ধান্ত সিংয়ের বিধবাকে। বদায়ুনে ওঁরা আরও বিচক্ষণ। ইউরোপীয় রেনেসাঁর ইতিহাসে পোপের ব্রোঞ্জমূর্তি গালিয়ে কামান তৈরীর উপাখ্যান আছে, বদায়ুনে বিদ্রোহীরা নীলের কড়াই গালিয়ে তৈরী করেছিল গোলাগুলি। তার পরেই বছর ঘুরে আসতে-না-আসতে বাংলায় নীল-বিদ্রোহ। নীল আগুন। সুতরাং, উদ্ধত ভঙ্গীতে

আকাশে চোঙ তুলে এ-বাড়ির এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। বস্তুত, নিয়তি তার সামনেই সময়ের অপেক্ষায়। আগুন যদি বা এড়িয়ে থাকে কোনও মতে, কালের-রোলার নিশ্চয় এতদিনে আপন কর্তব্য শেষ করেছে। এই নীলকুঠির কঙ্কালচূর্ণে হয়তো তৈরী হয়েছে গ্রাম বাংলার কোনও পথ, দিঘির ঘাট, অথবা কোনও গৃহস্থবাড়ির ঘরের সিঁড়ি।

এ-কুঠির ঠিকানা নাকি—বাংলা। বাংলার কোথায়, শতেক বছর পরে আজ চট্‌ করে তা বলা শক্ত। কেননা, সেদিনের বাংলায় অসংখ্য কুঠি। অজস্র। ১৮৫৯ সনে, অর্থাৎ আগুনের বছরে নিম্নবঙ্গেই নাকি নীল কোম্পানি ছিল ১৪৩টি, নীলকুঠি—৫০০। এ-বাড়ি তার মধ্যে যে কোন একটি হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। হয়তো সাকিন এর উত্তর বাংলা। তাতে কিছু আসে-যায় না। ক্ষুধিত-পাষাণ একই কাহিনী শোনাবে। তার আগে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নীল-উপাখ্যান। সামান্য সেই গাছটির কথা, যা একই সঙ্গে টাকার-গাছ এবং বিষবৃক্ষ।

আকাশ নীল। সমুদ্র নীল। সুতরাং, মানুষের ধ্যানে পালনকর্তা বিষ্ণুও ধারণ করলেন নীলবর্ণ। নীলের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। নীল আকাশে নীলকণ্ঠী পাখি উড়ে বেড়ায়, মাটিতে ফোটে নীল অপরাজিতা। ময়ূরের কণ্ঠ নীল, নীল ফুল ছড়িয়ে আছে বনে বনে। মানুষ কি চিরকাল নীল দেখেই যাবে দু'চোখ মেলে, দেখাতে পারবে না কোনও দিন? খুঁজতে খুঁজতে প্রকৃতির ভাণ্ডারেই পাওয়া গেল তিনশ' জাতের গাছ, অন্তর যার নীল বর্ণ। এর মধ্যে একমাত্র ভারতেই পাওয়া গেল চল্লিশ রকমের নীল গাছ। সব সেরা গাছটিও কেবলমাত্র ভারতেই মেলে। অতএব মিশরের মমিতে নীল বসনের সন্ধান পাওয়া গেলেও নীল বলতে দুনিয়ার মানুষ ভারতের নীলকেই বোঝে। নীল মানে—ইণ্ডিগো। নীলনয়না রোমান সুন্দরীও জানেন তাঁর এই নীলাম্বরীর নীল ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত থেকে কুড়িয়ে আনা।

এসব অনেক পুরানো কথা। রোমান-সাম্রাজ্যের সময়কার। তারপর শুরু হল সওদাগরি জাহাজের আনাগোনা,—বাণিজ্যের যুগ। ভারতের নীলে গোটা ইউরোপ তখন নীলবসনা। পুবের হাটে আর সব কারবারের মত নীলের বাণিজ্যেও প্রথম পর্তুগীজ, তারপর ডাচরা, এবং অবশেষে ইংরেজ। নীলের কারবারে চারশ' গুণ লাভ। সুতরাং, সুরাটে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে-সব জাহাজ ভিড়েছিল প্রথম দিকে, শুধু নীল বোঝাই করেই সেগুলো ফিরে গিয়েছিল স্বদেশের বন্দরে! ইউরোপে তখন বিকল্প বলতে ছিল—'ভোড' (woad)। তাকে হটিয়ে দিল ভারতের নীল। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাগিচা-মালিকেরা আকৃষ্ট হলেন এদিকে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি দেখা গেল ইউরোপীয়ানদের তত্ত্বাবধানে তৈরী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নীলে ভারতের নীলের বাজার দখলের উপক্রম। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল একদিন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাগিচা-মালিক আরও লাভজনক কৃষিকর্ম খুঁজে পেলেন আখ আর কফির চাষে। তবু অষ্টাদশ শতকের

মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ কাপড়ের কলগুলোর ভরসা স্প্যানিশ গুয়াতেমালা, আর ফরাসী সান্তা ডোমিনগো। তারপর সাউথ ক্যারোলিনা। এলো আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ। সুতরাং, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আবার তাকালো পুরানো নীলভাণ্ড ভারতের দিকে।

মতলব, এবার নিজেদের হাতে নীল তৈরী করা। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মানের নীল। ১৭৭৯ সন থেকে '৮৪ সন পর্যন্ত তার জন্য নানা উদ্যোগ। কিন্তু অধিকাংশই ব্যর্থ। জন প্রিন্সেপ নামে এক সাহেব কল বসালেন। কিন্তু পরিশ্রমই সার হল। নীল তৈরী হল না। প্রথম দিকে এসব কারখানা বসানো হয়েছিল আগ্রা-অযোধ্যা অঞ্চলে। বাংলার মাটিতে প্রথম নীল কুঠির আবির্ভাব ১৭৭৭ সনে। প্রতিষ্ঠাতা লুই বন্নো নামে এক ফরাসী। তাঁর কুঠি ছিল চন্দননগরের কাছে তালডাঙায়, আর গোন্দলপাড়ায়। পরের বছর আসরে নামলেন ইংরাজ কুঠিয়াল ক্যারল ব্লুম। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অভিজ্ঞ নীলকরদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই রাজ্যে। তার কিছুদিন আগে পর্যন্তও ইউরোপের বাজারে পাঁচ ভাগের চার ভাগ নীল রপ্তানি হত আগ্রা-অযোধ্যা অঞ্চল থেকে। কিন্তু কোম্পানির সেবাযত্নে অচিরেই এগিয়ে এল বাংলা। শতাব্দীর শেষে দেখা গেল অন্য সূত্র থেকে যত ভারতীয় নীল বিদেশে যায় বাংলা একাই যোগায় তার দ্বিগুণ। ১৮০২ সনে বাংলায় নীল সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প।

নীল পাঠানো মানে, টাকা পাঠানো। নীল গাছ 'প্যাগোডা ট্রি',—টাকার গাছ। সুতরাং, দেখতে দেখতে ব্যাঙের ছাতার মত চারদিকে গজিয়ে উঠল অসংখ্য কুঠি। ভাবনা নেই। টাকা জোগায় কোম্পানি, অর্থাৎ সরকার। সমস্যা শুধু কিছু জমি সংগ্রহ। কানুন অনুযায়ী তখন বিদেশীর পক্ষে এদেশে সম্পত্তির মালিক হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, বেনামীতে কিনতে হবে ৫০ কি ১০০ বিঘা। কিংবা ইজারা নিতে হবে। তারপর কিছু কড়াই গামলা সংগ্রহ করতে পারলেই ব্যস, নীল ভুইঞা হয়ে বসে যাও। লোকের অভাব নেই। বেওয়ারিশ দেশ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দাসদের মত শেকলে বেঁধে মাঠে নামালেও কেউ কিছু বলবে না। সুতরাং, অচিরেই দেখা গেল চারদিকে শুধু নীল আর নীল। জাহাজ, ব্যাংক, বীমা—সব কারবারই নীলনির্ভর, নীল-সম্পর্কিত। বাজার কখনও মন্দা, কখনও তেজী। তারই মধ্যে এগিয়ে চলল নীল-কাহিনী। ১৮৪২ সনের সংবাদ—কলকাতা থেকে যত মাল বিদেশে রপ্তানি হয়েছে তার শতকরা ৪৬ ভাগই নীল। আফিমের পরেই নীল সেরা ভারতীয় পণ্য। আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি নীল মানেই বাংলার নীল। এই কুঠিতেই তৈরী হতো সেই আশ্চর্য বস্তু রঙ যার নীল, কিন্তু কাহিনীটি লাল,—রক্তাক্ত।

—কী নাম তোমার সাহেব? তুমি কি লালবিহারী দে বর্ণিত সেই 'কম্বল?'

অথবা—'সন্দেশ ?' কিংবা—'বলদ ?' লালবিহারী "গোবিন্দ সামন্ত"-এ লিখেছেন—গাঁয়ের মানুষ সাহেবদের নাম সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না। ক্যাম্বেলকে তারা বলে—'কম্বল', স্যান্ডার্সকে 'সন্দেশ', বল্ডুইনকে—'বলদ।' লারমুর তাদের কাছে—লালমোহন। মারি—মহামারী মত। হতে পারে তুমি নীলডাঙার কুঠিয়ালদের কেউ নও, আদুরীর বর বিদ্রোহী মাধবকে হত্যার সঙ্গে তোমার কোন যোগ নেই। তবে কি তুমি নীল-দর্পণের স্বনামধন্য সেই উড সাহেব ? অদূরে সহিসের হাতে ঘোড়াটিকে সমর্পণ করে যিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনিই কি রোগ-সাহেব ? হতে পারে তোমরা অন্য মানুষ। হতে পারে যে দু' চারজন কুঠিয়াল ভালমানুষ বলে নাম কিনেছিলেন তোমরাই তাঁরা। সেক্ষেত্রে অপরাধ মার্জনীয়। কী করব বল, কুঠিয়াল মাত্রই আমাদের কাছে "নীল বাঁদর।" অথবা—"নীল মামদো।"

তোমাদের মতই সমান আকর্ষণীয় ঠেকছে ঘোড়া দুটি। অনেক ঘোড়া ছিল তোমাদের,—তাই না ? নিশ্চিন্তপুরের ঘোড়াশালে ছিল শুনেছি চল্লিশটি ঘোড়া। হাতিও থাকত কখনও কখনও। খুলনার কুঠিয়াল এক সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্র যাঁকে জব্দ করেছিলেন, সেই মরাল সাহেবেরই কোন এক সহযোগী শুনেছি হাতির শুঁড়ে মশাল বেঁধে সেই মশালের আগুনে গ্রাম জ্বালাতেন। তবে কুঠির সাহেবকে ঘোড়ার পিঠেই মানায় ভাল। এই ঘোড়ার পিঠে চেপেই বুঝি মারি-সাহেব হাজির হয়েছিলেন মাধবের ক্ষেতে। এই ঘোড়ার পিঠে চেপেই 'আলালের ঘরের দুলাল'-মতিলালের লোকেদের সঙ্গে দাঙ্গা করে কুঠিতে ফিরে এসেছিল সেই বিজয়ী কুঠিয়াল—"শোলার টুপি মাথায়—মুখে চুরুট—হাতে বন্দুক—খাড়া হইয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে।" পরক্ষণেই তাঁর অন্য মূর্তি "নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠিতে যাইয়া বিলাতী পানি ফটাস্ করিয়া ব্রান্ডি দিয়া খাইয়া শিস দিতে দিতে 'তাজা তোজা' গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে দৌড়ে খেলা করিতেছে।" এই ছবিতে কুকুরটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল ঘোড়া দেখছি। এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তুমি লড়াই করতে যেতে আশপাশের গাঁয়ে। আবার এই ঘোড়ায় চেপেই সময় বিশেষে প্রাণ নিয়ে পালাতে তুমি। ঘোড়ার পেটেও একবার অন্তত খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তোমাকে। সেটা শিকারপুর কুঠির ঘটনা। ঘটেছিল—১৮৩০ সনে। সে-সাহেবের নাম—ডিক সাহেব। এপ্রিলের এক চাঁদনী রাতে তাঁকে নাকি খুন করেছিলেন পাশের কুঠির ইয়ং সাহেব। মাটির তলায় একটি মরা ঘোড়ার পেটে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর দেহের নানা অংশ।—কে খুন করেছিল তাঁকে, সে রহস্যের এখনও নাকি মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনও নাকি হতে পারে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিল—গোরা-আনন্দ। ডিক সাহেবের সুরূপা রক্ষিতা।

কামিনী আর কাঞ্চন নাকি হাত ধরাধরি করে চলে। তোমাদের পকেট ভর্তি সেদিন মুঠো মুঠো কাঞ্চনে। সুতরাং, এসব আমোদ আদৌ দূষণীয় নয়। গোরা-আনন্দ ছাড়াও ডিক সাহেবের কুঠিতে আর এক আনন্দময়ী ছিল।

তার নাম—কালা-আনন্দ। হয়তো কোনও কৃষ্ণকলি। ইয়ং সাহেবেরও নেটিভ-সহচরী ছিল একজন। আউরঙ্গাবাদের কুঠির ম্যানেজার ম্যাকলিয়ড সাহেবের রক্ষিতার নাম ছিল পূর্ণবিবি। তার হুকুমেই নাকি ওই এলাকায় সূর্য উঠত, সূর্য ডুবত। সুতরাং হিলস সাহেব দশ হাজার টাকা খেসারত দাবি করে হরিশ মুখুজ্যের বিরুদ্ধে যতই মামলা দায়ের করুন না কেন, আর লঙ সাহেবকে তোমরা যতই জেলে পাঠাও না কেন ঈশ্বর গুপ্তই ঠিক। তাঁর রায়—"কুঠেল সব শাহেব-জাদা, ধবধবে বাইরে সাদা/ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি/পেকো গন্ধ তায়।"

কথায় বলে—"ভেড়ার মধ্যে বাঘ, হাঁকডাক বাজীমাৎ।" তোমরা বাজীমাৎ করেছ কেবল হাঁক ডাকে নয়, নানা হীন কৌশলে। তোমাদের প্রথম এবং প্রধান বল অবশ্যই টাকা। এবং সে টাকা রোজগার করতে তোমরা নানা ছলে। সাধারণত এক একজন ভূঁইয়ার দুটি করে কুঠি থাকত: কারও কারও আরও বেশী। জেমস হীল নদীয়ার নামকরা কুঠিয়াল। নিশ্চিন্তিপুরে তার প্রথম কুঠি। তারপর ক্রমে অন্যত্র গড়ে ওঠে আরও কুঠি। তৎকালে সবচেয়ে বড় কুঠিয়াল—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বারাসত এবং আরও নানা এলাকায় কুঠি ছিল তাঁদের। প্রধান কুঠি কলকাতা থেকে বাহান্ন মাইল দূরে মুলনাথ বা মোল্লাহাটিতে। ঢাকা এবং কাছাকাছি এলাকার কুঠির মালিক ছিলেন—ওয়াইজ নামে এক সাহেব। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী এবং পাবনায় সতেরটি কুঠি ছিল রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানির। ভারতীয়দের হাতেও কুঠি ছিল খান কয়। তার মধ্যে বড় মাপের কুঠি খানচারেক। উল্লেখ্য, এ-ব্যাপারে প্রথম বাঙালী উদ্যোগ দ্বারকানাথ ঠাকুরের।

নীলকুঠি মানে ট্যাঁকশাল। সেখানে নীল তৈরী হয় না, তৈরী হয় টাকা। কয়েকটা হিসাব শোনাই। আট আউন্স নীল পেতে হলে নাকি জমি চষতে হয় দুই হাজার বর্গফুট। কলকাতায় যখন নীলের বাজার-দর মন প্রতি দু' টাকা, এক বিঘা জমি থেকে নীলকরের লাভ নাকি তখন মাত্র বারো টাকা। খরচপত্র মিটিয়ে হাতে থাকে সাড়ে সাত টাকা। ব্যাপারটা আরও বিশদ করে বলা যাক। প্রতি বিঘা জমিতে নীল গাছ মিলত দশ বাণ্ডিল। পাঁচ মন নীল তৈরী করতে লাগে হাজার বাণ্ডিল গাছ। অর্থাৎ দশ বাণ্ডিলে পাওয়া যায় পাঁচ সের নীল। দাম তার দশ টাকা। এই দশ বাণ্ডিল নীল গাছের জন্য চাষী পেত বড়জোর দু' টাকা আট আনা। অথচ দশ বাণ্ডিল গাছ থেকে নীল তৈরী করতে নীলকরের খরচ মাত্র এক টাকা। সুতরাং, মুনাফার বহর অনুমেয়। নীলের কারবারে টাকায় টাকা লাভ।

সেই সত্য স্বপ্রকাশ। তোমাদের ওই কুঠিগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় নীল সোনারই আর এক নাম। এটা কারখানা। কুঠিয়াল এ-বাড়িতে বাস করেন

না। তাঁর কুঠিও আমরা দেখেছি। তোমরা কী ধরনের প্রাসাদে বাস করতে কলসওয়ার্দি গ্রাণ্টের "র্রাল লাইফ ইন বেঙ্গল"-এ তার ছবিও আমাদের দেখা। ইছামতী তীরে মোল্লাহাটির সে-দোতলা অট্টালিকার চওড়ায় ছিল এক শ' দশ ফ্ট। মাটির তলার ঘরে ভাঁড়ার, রসদ। ওপরে খাওয়ার ঘর, স্নানের ঘর, পোশাকের ঘর ছাড়াও আঠারো অ্যাপার্টমেণ্ট। চার পাশে স্রম্য বাগান। বাগানে হরিণ। সেখানেই বাস করতেন বিখ্যাত কুঠিয়াল ফরলং সাহেব। এই ধরনেরই আর একটি কুঠিরই কোনও এক ঘরে এক রাত্রে ওরা নিয়ে এসেছিল নাকি হরমণিকে। নীল-দর্পণের ক্ষেত্রমণি সে। সে কথা পরে।

ফরলং সাহেবের অধীন ছিল ৫৯৫টি গ্রাম। দুই লক্ষ গরিব প্রজার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তিনি। খাজনা দিতেন বার্ষিক ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তাঁর ঘরবাড়ির দাম ছিল ৫০ লক্ষ টাকার ওপর। এক নদীয়া জেলাতেই নাকি ১৮৹ লক্ষ টাকা ম্লধন হিসাবে খাটাত তাঁর কোম্পানি। কলসওয়ার্দি গ্রাণ্ট যখন তাঁর অতিথি, তখন তিনি রায়তদের দিয়ে চাষ করাচ্ছেন ৩১৬২ বিঘা জমি, তৎসহ খাস জমি ২৫০ বিঘা। স্তরাং, টাকা আসবে বৈকি! ফরলং অবশ্য ১৮৫৬ সনে মোল্লাহাটি ছেড়ে দিয়ে জেমস হিলস কোম্পানির অধীনে কাজ নেন। নতুন ঠিকানা নিশ্চিন্তপুর। মোল্লাহাটির কুঠির মালিকানা এলো বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির হাতে। নতুন কুঠিয়াল লারমুর। তিনি মুদ্রারাক্ষস। কুমারখালির এক কুঠিয়াল এত টাকা করে ফেলেছিলেন নীলের বাণিজ্যে যে দেশে যাওয়ার জন্য নিজেই জাহাজ গড়িয়েছিলেন একখানা। সে জাহাজের নাম' 'জানোরিয়া'। অবশ্য স্বদেশে আর ফেরা হয়নি তাঁর। জাহাজ নোঙর তোলার আগেই কোম্পানি হাত চেপে ধরেছিল তাঁর,—এই অর্থ কোম্পানির, তুমি তস্কর।

হতে পারে, ছবিতে যাঁদের দেখতে পাচ্ছি সেই সাহেবরা কোনও কুঠির মালিক নন, ম্যানেজার আর তাঁর সহকারী মাত্র। তাহলেও কিছু আসে যায় না। বিত্তে এবং ব্যবহারে তোমরাও সাহেব। সাহেবের মত সাহেব। থাকা খাওয়া সব নিখরচায়। ম্যানেজার হলে মাসিক নগদ মাইনে চার শ' টাকা। তদুপরি মুনাফার ওপর শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন। সহকারী-ম্যানেজার বা ছোট সাহেবের মাইনেও কম নয়, মাসে আড়াই শ' টাকা। তৎকালের মাপে প্রচুর টাকা। তার উপর চার পাশে লুঠ মহল। যখন যা খুশী কেড়ে নাও। সুখী সাহেব, সে কারণেই তুমি গাঁয়ের মানুষের কাছে নীল বাঁদর, নীল মামদো। তোমাকে দেখলে লোকেরা বিড়বিড় করে—"জাত মাল্লে পাদ্রী ধরে/ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে/ব্যাড়াল চোখো হাঁদা হেমদো/নীলকুঠির নীল মামদো!"

এবার ওই লোকগুলোর দিকে একবার তাকানো যাক। ওই যারা গরুর গাড়ি বোঝাই করে নীল নিয়ে আসছে, এই যারা সাহেবের চোখের সামনে মাথার

ঘোমটা টেনে বসে বসে নীলের বীজ বাছাই করছে। আর এক ধরনের নীলের পুজোর উদ্যোগ আয়োজন যেন।

সাহেব কুঠি হলেও সব কুঠিতেই ভারতীয় থাকতেন কিছু কিছু। তাদের ভাগ করা যায় তিন ভাগেঃ শাসন বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ আর পুলিস বা লাঠিয়াল বিভাগ। কোনও ভারতীয় কখনও কোনও নীলকুঠির ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজার হতে পেরেছেন বলে শোনা যায় না। ভারতীয়দের জন্য সর্বোচ্চ পদ ছিল—দেওয়ানের। নীলের জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র এবং দায়-দায়িত্ব তাঁর হাতে। মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা, দাদন বিতরণ সবই তাঁর কাজ। মাসে মাইনে পেতেন তিনি সাধারণত পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা। সেই সঙ্গে দাদনের টাকায় টাকা পিছু দুই পয়সা থেকে এক আনা দস্তুরী। তাঁর সহকারী কেরাণীদের মাইনে মাসে পাঁচ টাকা থেকে নয় টাকা। তবু কলসওয়ার্দি গ্রাণ্টের আঁকা ছবিগুলো দেখলে মনে হয় ওঁরা সত্যিই সুখী মানুষ। গ্রাণ্ট নিজেই লিখেছেন, মোল্লাহাটির প্রধান গোমস্তা বা দেওয়ান বাবু হরিশচন্দর মুখারজি "হ্যাপি ফেস্ড"। তাঁর মাথায় কোঁকড়ানো চুল, পায়ে চটি, গায়ে বাহারি শাল। পাদ্রী কুথবার্ট সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—মাইনে সামান্য হলেও কোনও কোনও গোমস্তা কুড়ি হাজার টাকা জমিয়েছিলেন। একজন পঞ্চাশ হাজার টাকা! সাধারণত গোমস্তা বলা হত কারখানা বা উৎপাদন ব্যবস্থায় যিনি প্রধান ব্যক্তি তাঁকে। নীল চাষের তদারকি করাও তাঁর কাজ। তাঁর মাইনে মাসে বারো টাকা থেকে কুড়ি টাকা। আমিন প্রভৃতি ওঁর সহকারী। তাদের মাইনে আরও কম, তিন চার টাকা। তবে অন্যভাবে রোজগার বাড়ানোর এবং পদোন্নতির সুযোগ বিস্তর। 'নীল-দর্পণে' আমিনের উক্তি স্মরণীয়। ক্ষেত্রমণিকে দেখে সে মনে মনে বলছে—"এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—!"

এখানে যারা নীলের বীজ বাছাই করছে তাদের মধ্যে বোধ হয় কোনও আমিনের বোন নেই। এ-কাজ পদী ময়রাণীকেও মানায় না। নীল কুঠিতে লাঠিয়াল জোগাত ফরিদপুর আর পাবনার কয়টি গ্রাম। সেখানে বিস্তর লোকের পেশা তখন লাঠিয়ালি। গাঁয়ের পর গাঁ লাঠিয়ালদের গাঁ। কারখানায় মালী মিস্ত্রি হরকরা আসত অনেক সময় বাইরে থেকে। অন্যান্য কাজ করত সাধারণত বাইরের মানুষ। নীল তৈরীর মরশুমে ঝাঁক ঝাঁক শ্রমিক আমদানি করা হতো মানভূম, সিংভূম এবং মেদিনীপুরের কোনও কোনও অঞ্চল থেকে। তাদের বলা হতো "বুনো কুলি"। তারা ছাউনি গেড়ে কুঠির আশেপাশে থাকত। মাইনে মাসে তিন টাকা। মেয়েদের এবং বালকদের দু' টাকা করে। মোল্লাহাটির কুঠিয়ালদের অধীনে কাজ করত ছয়শ' শ্রমিক। খাস মোল্লাহাটিতে খাটত একশ'। কে জানে, এই মেয়েরা হয়তো তাদেরই কেউ। এমনও হতে পারে আশ-পাশের গ্রাম থেকে পেটের চিন্তা টেনে এনেছে ওদের কুঠির দিকে। কিন্তু

পেট কি ভরে? ১৮৬০ সনে, অর্থাৎ নীল বিদ্রোহের বছরে চব্বিশ পরগণায় চালের মণ আড়াই টাকা, এক জোড়া কাপড়ের দাম এক টাকা, অথচ একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি বড়জোর তিন আনা। নীলের বীজ বাছাই করে কত আর পাবে ওরা? কাজের নামে এও এক ধরনের নীলের-উপোস!

—"ময়রানী লো সই, নীল গেঁজেছো কই?" নীল পচানো হতো এই সব ভাট বা চৌবাচ্চায়। জোড়া জোড়া চৌবাচ্চা। ছোটখাটো কুঠিতে থাকত ছয় জোড়া, বড়গুলোতে এমন কি পনের জোড়া। গরুর গাড়ি আর নৌকো বোঝাই করে নীলের আঁটি পেঁছত কুঠির নীলখোলায়। সংগে সংগে সেগুলোকে ফুলপাতা সমেত ভিজানো হত ওপরের চৌবাচ্চায়। তারপর বাঁশ দিয়ে চাপ দেওয়া হতো। চৌবাচ্চা ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে বাইরে, তবে নীল গেঁজানো হবে ভাল। সারা রাত্তির নীলগাছ পচবে সেখানে। সকালে এসে কুঠিয়াল পরখ করে দেখবেন জলের রঙ। তাপমান যন্ত্রে মেপে দেখবেন জলের তাপ। তারপর ছেড়ে দেওয়া হবে চৌবাচ্চার মুখ। জল নেমে আসবে এবার দ্বিতীয় চৌবাচ্চায়। হলদেটে রঙ। দুর্গন্ধময়। ইংগিত পাওয়া মাত্র দশজন শ্রমিক লাঠি হাতে লাফিয়ে পড়বে এবার এই চৌবাচ্চায়। নেচে গেয়ে তালে তালে দু'ঘণ্টা ধরে ঘাটাঘাটি করবে এই পচা জল। কুঠিয়াল আবার পরীক্ষা করবেন। হুকুম হবে এক সময় উঠে আসবার।

নিমেষে ওরা লাফিয়ে পড়বে ডাঙায়। তখনও পাক খাচ্ছে জল। রঙ এবার যেন নীলাভ। ওপরের দিকে বাদামী আস্তরণ। বাদামী জল বিদায় দেওয়া হবে একটি নলে। নীচে এবার পড়ে থাকবে জলমিশ্রিত গুঁড়ো গুঁড়ো নীল। এই তলানি চালান দেওয়া হবে বয়লারে। সেটা চৌবাচ্চা থেকে দূরে নয়, পাশেই। ঘণ্টা দুই জ্বাল দেওয়ার পর নীল ঢেলে দেওয়া হবে চালুনিতে। জল ঝরে যাবে, পড়ে থাকবে নীল কাদা। এবার তা যাবে প্রেসে, ছাপাখানায় নয়, চাপ দিয়ে জল নিষ্কাষণের যন্ত্রগুলো যে-ঘরে সেখানে। বার সাবানের মত টুকরো তৈরী হয়েছে এবার। বার কেটে তৈরী হবে চৌকো টুকরো, গায়ে পড়বে কোম্পানির শিলমোহর। এক একটি টুকরো তিন থেকে সাড়ে তিন বর্গ ইঞ্চি। এবার সেগুলোকে শুকোতে হবে। তিন মাস ধরে চলবে সে কাজ। চব্বিশ আউন্স ওজনের টুকরো তখন শুকিয়ে আট আউন্সে পরিণত। এবার কলকাতার নীলাম ঘর। সেখান থেকে জাহাজে বোঝাই হয়ে ইউরোপের কোনও বন্দর। কাদায় পদ্ম ফোটে, নীল ফলে রক্তে। শ্রমিকের রক্ত, কৃষকের রক্ত।

—তুমি কী বোঝা মাথায় চাপিয়ে ঘরে চলেছ, আমি জানি। আমরা সবাই জানি। এমন কি জানেন ওই কুঠিয়াল সাহেব এবং তাঁর এই সব অনুচরের দল,—

দেওয়ানজী, গোমস্তা, আমিন, কেরানী এবং অতি-চালাক ওই ওজনদার। ওরা নীলের বীজ গছিয়েছে তোমাকে। দুঃখের বীজ। বিষবৃক্ষের বীজ। তোমার মাথার ওই থলিতে সুতরাং দুর্ভাবনার বোঝা। তুমি দাদন নিয়েছ। তোমার মুখে তাই থমথমে অন্ধকার। তুমি কাঁদছ। তোমার বউ কাঁদছে। ছেলে কাঁদছে।

দুই ধরনের চাষ হতো নীলের। নিজাবাদ আর রায়তী। নিজাবাদ চিরাচরিত বাগিচা-শিল্পের মত। জমি কুঠিয়ালের নিজের। নিজের তত্ত্বাবধানে মজুরির বিনিময়ে তিনি সে জমি চাষ করাতেন। যেমন চা, রবার, কিংবা কফি বাগিচা। নীল চাষে এ ধরনের কৃষিকর্ম কম। বাংলায় অধিকাংশ জমিই ছিল রায়তী। রায়তী বন্দোবস্তে চাষের খরচ অনেক কম। কুঠিয়াল হিসাব করে দেখেছেন এক বিঘা খাস জমিতে নীল চাষ করতে খরচ পড়ে যেখানে ৬ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই, দাদনী জমিতে সেখানে ২ টাকা ৩ আনা খরচ করতে পারলেই যথেষ্ট। জমির মালিক জমিদার। প্রজাসমেত তিনি সে জমি পত্তন করতেন কুঠিয়ালকে। ১৮৩৩ সনের আগে কোনও কুঠিয়াল এদেশে ভূসম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন না। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর তিনি নিজের নামেই পত্তনী নিতে লাগলেন। সে জমি যদিও তাঁর খাস জমির মত "ইলাকা" নয়,—"বে-ইলাকা", তবু চাষীর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তিনি। তাঁর হুকুম অমান্য করে এমন সাধ্য কারও নেই।

কৌশল অতি সহজ। পত্তনী পাওয়ার পর কুঠিয়ালদের প্রথম কাজ গাঁয়ের কামারকে পাকড়াও করে এনে কার ঘরে কয়টা লাঙ্গল আছে তার হিসাব নেওয়া। তারপর অন্যভাবে সম্ভব না-হলে, লাঠিয়াল পাঠিয়ে চাষীদের কুঠিতে ধরে এনে দাদন গছিয়ে দেওয়া। চাষীকে ধরার জন্য অনেক সময় অন্য কৌশলও নেওয়া হত। চাষীর গরু কুঠির বাগানে ঢুকেছিল, এই মনগড়া মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তার গরু এনে কুঠির খোঁয়াড়ে আটক করা হতো। গরুর মায়ায় উদ্বিগ্ন চাষী নিজে থেকে এসে ধরা দিত। তখন টিপ সহির জন্য সাদা কাগজ মেলে ধরা হতো তার সামনে। দেওয়ানের হাতে খাতা কলম টাকা, কুঠিয়ালদের হাতে "শ্যামচাঁদ", অথবা "রামকান্ত"। চাবুকের জোরে আদায় করা হতো বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ। চাবুক দেখিয়েই ট্যাঁকে গুঁজে দেওয়া হতো কয়টি টাকা,—দাদন। দাদনের হার বিঘা প্রতি নীলের জন্য দুই টাকা।

চুক্তিপত্রে লেখা আছে তুমি কত জমিতে নীল বুনবে, কী দরে সাহেবকে নীল বেচবে সেসব কথা। লেখা না থাকলেও একটু পরেই তা লেখা হবে। লিখবেন ওঁরাই। সাক্ষীও ওঁরা নিজেরাই। তুমি এসব জান না। শুধু এটুকু জান, তুমি দাদন নিয়েছ। নীলের দাদন। একটু পরেই আমিন গিয়ে পছন্দসই জমিগুলিতে কুঠির চিহ্ন বসিয়ে আসবে। তুমি 'হায় হায়' করে উঠবে। কিন্তু মুক্তির আর কোনও পথ নেই। তুমি দাদন নিয়েছ। তুমি চুক্তিবন্ধ। দেশের আইন তোমার বিরুদ্ধে, দেশের সরকার তোমার বিরুদ্ধে। হত্যা, লুঠতরাজ, নারী নিগ্রহ, গৃহদাহ—এবার অনেক কাণ্ডই ঘটতে পারে। ঈশ্বর জানেন, তোমার

জন্য কী অপেক্ষা করে আছে।

বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন সাহেব নিজে কবুল করেছেন, ১৮৩০ সন থেকে ১৮৫৯ সনের মধ্যে তাঁর এলাকায় ৪৯টি মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। কুঠির গুদামে কয়েদ রাখা তো কোন্ ছার, কুঠিয়াল দাঙ্গা, লুঠ, আগুন—সব দুষ্কর্মেই সমান দক্ষ এবং বেপরোয়া। মরে গেলে গলায় ইঁট বেঁধে নদীতে ছুঁড়ে দেন ওঁরা, কাকপক্ষীও টের পায় না।

শুধু মৃত্যুভয়ে নয়, চিন্তিত তুমি নানা কারণে। জমিতে বীজ ছড়িয়ে দিলেই অবশ্য নীল হয়। কিন্তু ডাঙার জমি তৈরী করা চাই যত্ন করে। লাঙল দিতে হবে, মই দিতে হবে। তবেই সে-জমিতে নীলের বীজ বোনা। বীজ ছড়াতে হয় এপ্রিল মাসে, বসন্তে বৃষ্টির মুখে যখন, কাটার সময় জুন থেকে আগস্ট। বসন্ত ধান চাষেরও সময়। সুতরাং, নীলচাষ মানে, ধান চাষ বন্ধ। ভয়ের অন্য কারণও আছে। ধানের বদলে একবার নীল বুনলে জমি চিরকালের মত চিহ্নিত হয়ে যায় নীলের জমি বলে। তখন ছাড়া পাওয়া আরও শক্ত। তৃতীয়ত, সাহেবদেব মত নীলও আদুরে জিনিস. তার সেবা যত্ন করা চাই। আগাছা বাছাই করতে হয়। ফসল তৈরী হওয়া মাত্র পেঁছে দিতে হয় কারখানায়। কাটা ফসল একদিন মাঠে ফেলে রাখা মানে, সব নষ্ট। অথচ, আজব ব্যাপার এই, সে দায়িত্বও তোমার। তুমি দাদন নিয়েছ।

এসব ঝক্কি ঝামেলা তবু পুষিয়ে যেত, যদি উপযুক্ত দাম মিলত। কিন্তু তুমি জেনে গেছ, কুঠিয়ালের কারবার ফাঁকির কারবার। বাংলা মুলুকে ১৪০০০ বর্গফুটে এক বিঘার মাপ। কুঠিয়ালের বিঘা ২১৫১১ বর্গফুটে। নীলের আঁটি বয়ে নিয়ে তুমি যখন কুঠিতে পেঁছাবে তখন পালোয়ানের মত একটি লোক ছয় ফুট লম্বা এক শিকলে আঁটিগুলো মাপবে। ওর বাহুতে অনেক বল, সুতরাং তোমার দশ আঁটিতে ওর পাঁচ আঁটিও হয় কিনা সন্দেহ। তুমি কিন্তু দাম পাবে আঁটির হিসাবে। টাকায় চার থেকে ছয় আঁটি। খাটুনিই সার। খাতা খুললে দেখতে পেতে তখনও তুমি কুঠিয়ালের কাছে ঋণী, সারা বছর পরিশ্রম করে দাদনের টাকাই শোধ করতে পারনি। কেউ কোনদিন পারে না। তিন পুরুষেও দাদনের টাকা শোধ হয় না।

কুঠিয়াল অবশ্য অন্য কথা বলবেন। তাঁর হিসাবে তোমার খরচ যৎসামান্য। এক বিঘা জমির জন্য তোমার খরচ হয় দশ আনা, বীজ—চার আনা, চাষের খরচ—এক টাকা, বীজ বোনা—চার আনা, নিড়ানি খরচ—আট আনা, ফসল কাটা—চার আনা, স্ট্যাম্প—দুই আনা। একুনে তিন টাকা। দাদনের দুই টাকা বাদ দিলেও বিঘা প্রতি লাভ তোমার এক টাকা। এটাও ফাঁকির হিসাব। ১৮৬০ সনে বাংলার গভর্নর নিজে হিসাব কষে দেখিয়েছেন নীল চাষে তোমার ক্ষতি বিঘা প্রতি প্রায় সাত টাকা। তারপরও আছে সেলামি ঘুষ ইত্যাদি। কুঠির লোক এসে আজ ক'খানা বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, কাল সাহেবদের প্রাতরাশের নাম করে নিয়ে গেল

কিছু ডিম, পরশু হয়তো তুলে নিয়ে যাবে মুরগিগুলোই। সুতরাং নীল চাষ তোমার কাছে দুঃখের আবাদ। "—টাকা টাকা টাকা/গায়ের রক্ত পানি করেও/ হাতের মুঠি ফাঁকা।"

তবু চাষ করতে হবে তোমাকে। কারণ তুমি দায়বদ্ধ। কোম্পানির আইন অনুযায়ী সেটা তোমার পবিত্র দায়িত্ব। ১৮২৩ সনের ষষ্ঠ আইন বলেছিল—দাদনের বদলে জমিতে নাকি কুঠিয়ালের এক ধরনের স্বত্ব জন্মায়। '৩০ সনের কুখ্যাত আইনের মর্ম—চাষী নীল চাষ করতে অস্বীকার করলে দণ্ড হবে। কারাদণ্ড। ১৮৫৯ সনের আইনে তোমার জন্য কিছু সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল বটে। কিন্তু তোমার সাধ্য কী জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই কর? আইন অতএব তোমার কাছে সত্যই "তামাশা"। তা ছাড়া নীলকর শুধু জমিদার নয়, তিনি একাধারে জমিদার, মহাজন এবং বিচারক। দিশি বিচারকদের কোনও ক্ষমতা নেই তাঁদের কাঠগড়ায় তোলেন। বেথুন অবশ্য একটা আইন করেছিলেন। কিন্তু নীলকররা হল্লা জুড়ে দেয়—সে আইনের বিরুদ্ধে। ওদের বলবান অ্যাসোসিয়েশন। দুই দুইটি সমর্থ কাগজ 'ইংলিশম্যান' আর 'হরকরা' ওঁদের হাতে। তারপর এদেশে এবং ইংল্যাণ্ডে প্রভাবশালী "লবি।" বাধ্য হয়েই বেথুনের খসড়ায় অনেক জল মিশাতে হল শেষ পর্যন্ত। ওদিকে মিউটিনি উপলক্ষে অনেক নীলকর নিজেরাই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বনে গেছেন সরকারী প্রসাদে, হুতোম প্যাঁচার ভাষায়—"প্যায়াদারা পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মফঃস্বলে চল্লেন।" সুতরাং, তুমি সুবিচার কোথায় পাবে?

রক্ত জলের চেয়ে ঘন। সরকার সব সময়ই কুঠিয়ালের পক্ষে। তোমরা যখন বিদ্রোহী, নীলের জমি যখন পতিত, সরকার তখন তোমাদের জেলে পুরেই ক্ষান্ত হননি, বিঘা প্রতি কুড়ি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন কুঠিয়ালদের। বিচারক আর অপরাধীর মধ্যে সেদিন অবিশ্বাস্য বন্ধুত্ব। নীল-দর্পণে ইন্দ্রাবাদ জেলের জমাদার দারোগাকে বলছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসতে আরও দিন চারেক দেরী হবে। "—শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমাদের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি।" "সংবাদ প্রভাকর" লিখছে (১৮৪৮) —"নীলকর দিগের মধ্যে অনেকেই ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকেহ্যান করেন, এবং ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সহিত কোন ২ নীলকরের আলাপ ও কুটুম্বিতা আছে।" অন্যত্র প্রভাকর আরও খোলাখুলি আলোচনা করেছে ম্যাজিস্ট্রেট আর নীলকরের এই বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ। লেখকের বক্তব্য—"শীত ঋতুতে যখন হাকিম মহাশয়রা টোয়ারে যাত্রা করেন তখন নীলকর বন্ধুদের কুটিতে একসঙ্গে অবস্থিতি করত স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে মাসত্রয় পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে বিবিধ সুগন্ধ সুস্বাদু উপাদেয় ইংরাজী খাদ্যাহার দ্বারা শরীর হৃষ্টপুষ্ট করিয়া মহকুমায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইউরোপীয়ান লোকেরা স্বভাবতই ধার্মিক কৃতজ্ঞ ও ন্যায়বান,

সুতরাং সেই সমুদায় পোষ্টাবর কুঠিয়ালদের প্রত্যুপকার সাধনাভিপ্রায়ে তাহাদের যত মোকদ্দমা বিচারালয়ে উপস্থিত থাকে তাহা তাহাদেরই অভিমতানুরূপে নিষ্পত্তি করেন।” সুতরাং তোমাকে রক্ষা করে কে? “—বাড়া ভাতে ছাই তবু বাড়া ভাতে ছাই। ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।”

নানাভাবে বাঁচতে চেয়েছেন সেদিন বাংলার অসহায় চাষী। ‘সাহেব, তুমি আমার মা বাপ’ বলে জড়িয়ে ধরেছেন সাহেবদের পা। কখনও ছুটে গিয়েছেন গাঁয়ের মোড়ল কিংবা “দেশের মাথা” জমিদারের কাছে। কখনও ভিনদেশী পাদ্রীর কাছে। আবার কখনও বা শরণাপন্ন হয়েছেন খোদ সরকার বাহাদুরের।

শান্তিপুরের জার্মান পাদ্রী বমভাইটস লিখেছেন—ওরা এসে একদিন আমাকে ধরে পড়ল তালুক কিনে নেওয়ার জন্য। কেন না, নীলকর পত্তনী নিলে বিপদ। কুঠিয়াল আর্চিবল্ড হিল-এর হাত থেকে বাঁচতে চায় ওরা। ওরা এমন কথাও বলল যে, আমি তালুকটি কিনে নিলে অর্ধেক টাকা তারা চাঁদা তুলে দিয়ে দেবে। এই পাদ্রী সাহেবের কাছে নালিশ করার অপরাধে কুঠিয়াল চাষীদের ওপর জরিমানা ধার্য করেছিল পঁচিশ টাকা। কাপাসডাঙার পাদ্রী স্যুড সাহেবের কাছেও বিস্তর দৌড়াদৌড়ি করেছেন আশপাশের কৃষকেরা। মিশনারী সাহেব লিখেছেন—একদিন দু’তিনজন লোক ছুটতে ছুটতে হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির।—সাহেব, বাঁচাও। কুঠির লাঠিয়ালরা আমাদের সব গরু ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সাহেব ছুটলেন সেদিকে। লোকগুলো সরে পড়ল। আর একদলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে পালাতে হল নিজেকেই। আমিন নাকি হাঁক দিয়েছিল—সাহেব কো মারো।

কুঠিয়ালের কাছে দরবার করে লাভ নেই। দাস মালিকের মনোভঙ্গী তাঁর। ধর্ম, মানবতা, এসব তার কাছে অবান্তর চিন্তা। একমাত্র ধ্যান আরও মুনাফা। আর তাঁর কাছে পৌঁছানোই কি সহজ? দীনু মণ্ডল বলেছিলেন—আমি যদি বড় সাহেবের কাছে যাই তবে স্মিথ সাহেব রেগে ওঠেন, যদি স্মিথ সাহেবের কাছে যাই তবে দেওয়ান চটে যান, যদি দেওয়ানের কাছে যাই তবে আমিন রাগ করেন, আর যদি আমিনের কাছে যাই তবে গোঁসা করেন তাগিদগীর।

রাজ-সরকার আরও অনেক ওপরে। তবু ওঁবা চেষ্টা করেছেন নিজেদের দুঃখের কথা সরকারের কানে তুলতে। ছোটলাট পিটার গ্র্যাণ্ট কাজ দেখাশোনার জন্য সফরে বের হয়েছিলেন একবার। ১৮৬০ সনে। তাঁর পথের দু’ধারে হাজার হাজার রায়তের ভিড়। তাঁদের হাতে আর্জি—সরকার, আমাদের বাঁচাও। এক জায়গায় স্টীমার ঘাটে ভিড়ছে না দেখে ওঁরা নাকি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জলে। মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন ওঁরা এই স্টীমারের পিছু পিছু।—লাটসাহেবকে দুঃখের কথাটা জানানো দরকার।

গ্র্যাণ্ট এবং তাঁর মত জনাকয় রাজপুরুষ অবশ্য কৃষকের প্রতি সহানুভূতি-

সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু সমগ্র বিষয়টা পর্যালোচনা করলে সন্দেহ থাকে না, অন্তে সরকার বাহাদুর ছিলেন নীলকরদেরই অনুকূলে। শুধু জাতি এবং বর্ণগত কারণে নয়, ব্যবসায়িক কারণেও। দুইয়েরই লক্ষ্য শোষণ। সরকারের মতলব যদি পারা যায় নিঃশব্দে শান্তি অক্ষুন্ন রেখে মতলব হাসিল করা, এই যা। সমস্যা যখন সংকটে পরিণত তখনও জোড়াতালির দিকেই তাঁদের নজর। চাষীর নামে আইন তৈরী করেন তাঁরা, কিন্তু আইনের মূল লক্ষ্য নীলকরের উন্নতি বিধান। ফলে, নীলকরও ক্রমে আরও বেপরোয়া। অবশেষে তাঁর চক্রান্তে সরকার পর্যন্ত দিশাহারা। নিজেদের হাতে রচিত আইনগুলোও গ্রাম বাংলায় চালু করতে পারছেন না তাঁরা। ১৮৫৪ সনে পচাপোড়ার কুঠির মালিক ম্যাকেঞ্জির বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করতে গিয়ে ধমক খেলেন যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ। কুঠিয়ালের চক্রান্তে সেখান থেকে সরতে হল তাঁকে। ছোট-লাটকেও স্বীকার করতে হল—নীলকর অপ্রতিবোধ্য। ওঁরা "স্টেট উইদিন স্টেট," —এক রাষ্ট্রের মধ্যে আর এক রাষ্ট্র। স্বাধীন, স্বৈরাচারী। ওঁদের বশে আনা দুঃসাধ্য।

সুতরাং, শেষ পর্যন্ত সে কাজের দায়িত্ব নিতে হল বাংলার চাষীকেই। "প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে", লিখেছিল "ক্যালকাটা রিভিউ"। "এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। যে মহকুমা থেকে বদলি করা হয়েছিল আবদুল লতিফকে সকলের আগে সেখানেই জ্বলল আগুন।" নীল আগুন। সেটা ১৮৫৯ সনের কথা। সেদিন সহসা বাংলার অন্য মুখ, অন্য চেহারা। "ক্যালকাটা রিভিউ" লিখছে—আকস্মিক এবং অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন। মুহূর্তে ওঁরা স্বাধীন। যে রায়তদের আমরা ক্রীতদাসের মত, রুশদেশের ভূমিদাসের মত ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম, যাদের আমরা প্রাণহীন নির্বিরোধ যন্ত্র বলে গণ্য করতাম, অবশেষে তারই হঠাৎ জেগে উঠল। সকলের মুখে এক কথা—আর নীল নয়। কখনো নয, কিছুতেই নয়।

দীনু মণ্ডলের জবানবন্দী—আমার গলা কেটে ফেললেও আমি আর নীল বুনবো না। বরং মরব, তবু নীল বুনবো না। জামির মণ্ডল বলল—আমি এমন দেশে পালিযে যাব যেখানে কখনও নীল চোখে দেখেনি, যেখানে কেউ কখনও নীল বেনে না। হাজি মোল্লার বক্তব্য—বরং ভিক্ষে করে খাব তবু নীল বুনবো না। কবির মণ্ডলের ঘোষণা—আমি কারও জন্য নীল বুনবো না, এমন কি নিজের বাপ-মার জন্যও না। পাঁচু মোল্লার কথা—আমাকে গুলি করে মেরে ফেল, তবু আমি নীল বুনবো না।

চারদিকে সকলের মুখে এক অঙ্গীকার,—নীল বুনবো না। কুঠিয়াল হঠাৎ সম্পূর্ণ অসহায়। আদালতে নালিশ করা শক্ত। সাক্ষী জোটে না। এমন কি কুঠির কর্মচারীরা পর্যন্ত আদালতে যেতে ভয় পায়। ওরা হাট বাজারে যেতেও ভরসা পায় না। ভৃত্যেরা কুঠি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। "হঠাৎ সমগ্র জেলায় বিপ্লব।"

এক জেলা থেকে আগুন আর এক জেলায়।

মোল্লাহাটির সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পেল আহত। আধমরা করে মাঠে ফেলে রাখা হয়েছিল তাঁকে। খাজুরার কুঠি লুণ্ঠিত। লুঠের পর কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দাদনের খাতাপত্র ছুঁড়ে দিয়েছেন ওঁরা সেই আগুনে। লোকনাথপুরের কুঠি আক্রান্ত। চাঁদপুরের কুঠির গোলায় আগুন। বামনদিতে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের কাজ চলছে। আউরঙ্গাবাদে ওরা ঠিক করেছে কুঠির মেমসাহেব আর তার মেয়েকে দিয়ে নীল বোনাবে। বাঁশবেড়িয়া আর খাল বোয়ালিয়ায় কুঠির সাহেব-মেমরা তাড়া খেয়ে পালিয়েছেন। তাঁরা নাকি মাথায় কালো হাঁড়ি চাপিয়ে কলিঙ্গা খালের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। প্রতিদিন নিত্য নতুন সংবাদ। কৃষ্ণনগর জেলা আয়ত্তের বাইরে। বাহান্নটি গ্রামের দু' হাজার চাষী পাবনার এক কুঠিতে ঘেরাও করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিস বাহিনীকে। সড়কির আঘাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোড়া জখম। যশোহর, নদীয়া, চব্বিশপরগণা, পাবনা, রাজসাহী, মালদহ, ফরিদপুর, যেখানেই নীল সেখানেই আগুন। আগুন সর্বত্র।

বাংলার কৃষকের মতই দর্শনীয় সেদিন অবশিষ্ট বাংলার মুখ। কিছু কিছু জমিদার প্রজার পাশে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ পিছনে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য নড়াইলের রামরতন রায়, রাণাঘাটের শ্রীগোপাল পালচৌধুরী আর শ্যামচন্দ্র চৌধুরী এবং জয়রামপুরের মল্লিকরা। রামরতন খ্যাতি লাভ করেছিলেন "ইন্ডিগো প্ল্যান্ট ডেস্ট্রয়ার" হিসাবে। বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক হিসাবে বর্ণিত মহেশ চ্যাটার্জি ছিলেন তাঁরই নায়েব। এমন ঘটনার দৃষ্টান্তও আছে। রামরতনের লাঠিয়ালরা নীলের ক্ষেতকে রাতারাতি নারকেল ক্ষেতে পরিণত করেছে! একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, জমিদারদের এই ভূমিকার পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ছিল। অথবা আহত মর্যাদাবোধ। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবু বলেছিলেন—আদালতে অপরাধী কুঠিয়াল চেয়ারে বসে, আর আমরা যাঁরা নালিশ করলাম তাঁদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, বসবার জন্য একখানা টুলও জোটে না—এ কেমন কথা? নিজের প্রজাকে যাতে সাহেবের কুঠিতে যেতে না হয়, সেজন্য ওঁরা নিজেরাই কিছু কুঠি বসিয়েছিলেন।

চার্চ মিশনারী সোসাইটির ভূমিকায়ও হয়তো স্বার্থচিন্তা ছিল। পাদ্রীদের মধ্যে গোষ্ঠী ভেদ ছাড়াও খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারের বাসনা হয়তো ওঁদের ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল চাষীর পাশে। রেভাঃ লঙ ছিলেন আইরিশ। অন্যরা অনেকেই জার্মান। "হোয়ের ইজ দি জারমানস ফাদারল্যান্ড?" প্রশ্ন তুলত নীলকরদের কাগজগুলো। বমভাইটস-এর নেটিভ প্রীতির প্রতি কটাক্ষ করে একটি কাগজ সরাসরি লেখে—পাদ্রী সাহেবের প্রেরণা তাঁর বঙ্গদেশীয় পত্নী। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, ওঁরা শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান সংগ্রামীতে পরিণত। স্মরণীয় লঙের উক্তি—যতদিন

আমি বেঁচে আছি, আমার চিন্তা করার মত মস্তিষ্ক আছে এবং হাতে আছে লিখবার মত কলম, ততদিন আমি সাধারণের সুখ দুঃখের কথাই লিখব।

সে-প্রতিজ্ঞা সেদিন বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলেও। সে যেন অন্য জন্মের কাহিনী। রংপুরের প্রজাবিদ্রোহ (১৭৮৩) উপলক্ষে গাঁয়ের কবি লিখেছিলেন —"চারিভিতি হতে আইল রংপুরের প্রজা।/ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবারে মজা।" নীলবিদ্রোহ উপলক্ষেও এ-জাতীয় ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেছে,—"মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আঁটি। কলকাতার বাবু ভেয়ে এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে বলে।" বাংলায় প্রবাদ—"চাষা মরে কাজ করি, বাবুর মুখে কথার তুবড়ি।" নীল বিদ্রোহ তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম যেন। সাতান্নর মহাবিদ্রোহে যে বাঙালী বুদ্ধিজীবী বিহ্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পলাতক, দু' বছর পরে নীল উপলক্ষে তাঁরাই সবচেয়ে বাঙ্ময়। কলমের মুখে আগুন। হরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল, শিশিরকুমার, বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিন্দু প্রভাকর—সবাই চাষীর পাশে। কাগজ খুললেই নীল, বই খুললেই নীল। নীল আলালের ঘরের দুলালে, নীল মশারফ হোসেনের লেখায়। এমনকি বাঙালী দারোগাবাবুও সেদিন নীলচাষীর দুঃখে কাতর। তিনি নিয়মিত চিঠি লেখেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ। এদের মধ্যে সবচেয়ে অকুতোভয় হরিশচন্দ্রর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর তরুণ সম্পাদক কাগজ আর কলমেই নিজেকে আটকে রাখেননি, এগিয়ে গিয়েছিলেন আরও অনেক দূর। প্রজার সপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মফঃস্বলে মোক্তার পাঠানোর পিছনেও ছিলেন নাকি তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছিলেন— "ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জল প্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই।"

নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণিকেও আলোকে এনেছিলেন তিনিই। ক্ষেত্রমণির প্রেরণা আসলে নাকি হরমণির কাহিনী। সে কাহিনী প্রথম ছাপা হয়েছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট-এর পৃষ্ঠায়, একটি চিঠিতে। ১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নদীয়ার এক গৃহস্থ মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ হরমণি অপহৃত হয়। অপহরণ করে কাচিকাটা কুঠির কুঠিয়াল আর্চিবল্ড হিল। লেঠেল বাহিনীর সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চড়ে হিল নিজে যোগ দিয়েছিলেন সেই অভিযানে। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত নাকি কুঠিতে আটক ছিল হরমণি। তারপর তাকে ফেরত দিয়ে আসা হয় দুর্গাপুর কুঠির আমিনের কাছে। আগে অবশ্য আরও দুই জায়গায় রেখে আসার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কেউ হরমণিকে রাখতে রাজি হয়নি। এই লোকটি ছিলেন মাথুর বিশ্বাসের আত্মীয়।

হিল ছাড়া পেলেও ঘটনাটা গোপন করা সম্ভব হয়নি। নীল কমিশনকেও পুনরাবৃত্তি শুনতে হয়েছে এই ঘটনায়। হুতোমের উক্তিঃ কমিশনে কেঁচো

খ‍ুঁড়তে খ‍ুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো।

নীল কমিশন বসেছিল ১৮৬০ সনের মার্চ মাসে। সদস্য পাঁচ জন। এই কমিশন মে মাস থেকে আগস্টের মধ্যে ১৩৬ জনের সাক্ষ্য নেন। তাদের মধ্যে ৭৭ জন প্রজা। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সনের ২৭ আগস্ট। নীলদর্পণ-এর প্রথম প্রকাশ ১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর। মাইকেল কর্তৃক রাত জেগে তার অনুবাদ, লঙ সাহেবের বিচার এবং জেল—এসব উপাখ্যান সর্বজনবিদিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শুধু দুই একটি টুকরো সংবাদ। নীলকরেরা এক সময়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেও নাকি 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর গ্রাহক তালিকা সংগ্রহ করতে পারেন নি। লঙ-এর বিচারের পর বাঙালী আরও সচেতন। কুড়ি হাজার লোকের সই নিয়ে তাঁরা এক দরখাস্ত করেছিলেন সরকারের কাছে। নগদ পাঁচ শ' টাকার বিনিময়েও 'ইংলিশম্যান' সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব হয়নি তার একটি কপি সংগ্রহ।

তার চেয়েও দৃঢ় কৃষকের প্রতিরোধ। বস্তুত, নীল বিদ্রোহের প্রকৃত নায়ক তাঁরাই। চৌগাছার বিশ্বাস ভ্রাতৃযুগল, আসাননগরের মেঘাই সর্দার, আউরঙ্গাবাদের মুরাদ বিশ্বাস, সুভাষ বিশ্বাস, বাঁশবেড়িয়ার বৈদ্যনাথ আর বিশ্বনাথ সর্দার,—আরও অনেক নাম সেদিনের বাংলার গ্রামাঞ্চলে। চাষীর মুখে নাম তাঁদের কারও নানা সাহেব, কারও তাতিয়া টোপি। একজন লেখক লিখেছেন—"কত ওয়াট, টাইলার, হ্যামডেন ওয়াশিংটন নিরন্তর বাংলায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন, ক্ষুদ্র বনফুলের মত মনুষ্য নয়নান্তরালে ফুটিযা ঝটিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিনা।..."

লড়াই যেমন তাঁদের নিজেদের তেমনই লড়াই-কৌশলও তাঁদেরই। ভাড়াটে লেঠেলের বদলে গড়ে উঠল স্বেচ্ছাবাহিনী। গাঁয়ের প্রান্তে গাছের ডালে ঝুলত দুন্দুভি। কুঠিয়ালের লোক গাঁ আক্রমণ করতে আসছে দেখলেই তাতে কাঠি পড়ত। গ্রামের লোক নিমেষে তৈরী। বমভাইট বল্লভপুরের প্রজাদের লড়াইয়ের এক বিবরণ দিয়েছেন। নানা অস্ত্রে সজ্জিত ছয়টি বাহিনী। তার মধ্যে এক দলের হাতিয়ার কাঁচা বেল। সড়কিওয়ালাদের নাম—যুধিষ্ঠির কোম্পানি!

শেষ পর্যন্ত নীলকর দেশছাড়া হলো। বাংলা থেকে তাড়া খেয়ে বিহারে, বিহার থেকে মাদ্রাজে। তারপর হঠাৎ একদিন নীল মামদো সত্যিই ভূত, তাকে আর চোখে দেখা যায় না। এর পেছনে নানা কারণ। এক কারণ জার্মান রসায়নবিদ অ্যাডলফ ফন বেইয়ার কর্তৃক কৃত্রিম নীল উদ্ভাবন। সেটা ১৮৮০ সনের কথা। ক' বছর পরে (১৯০৫) আর এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সেরা পুরস্কার আদায় করেছিলে বোধহয় তোমরা। বাংলার চাষী, নীল তোমার চোখের আগুনেই দেশছাড়া। কে জানে, হয়তো কলকাতা থেকে উপরের ওই বাক্সগুলোই শেষ বাক্স। ওর ভেতরে বাইরে, সর্বত্র তোমার রক্ত। একজন পাদ্রীর উক্তি—নীলের প্রতিটি বাক্স রক্তরঞ্জিত।

অন্য ডাকাতরা

"ভ। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি?

ভ আমি রাজত্ব করি।

প্র ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব?

ভ যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ এদেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংগরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া?

ভ। শুন, বুঝাইয়া দিতেছি।"

(দেবী চৌধুরাণী)

"আমরা বারাকপুরের নিকট টিটাগড়ের রাজু বৈষ্ণবের দলের। ঘটকের মুখে সংবাদ পাইলাম যে চুঁচুড়ার মাধব দত্ত কলিকাতার তিন চারিটি অফিসের মুচ্ছুদী আর বড় ধনী। ইহাও সংবাদ হইল যে মাধব দত্তের গঙ্গাতীরের বাটীর

খুব নিকটেই গোরাবারিক আর সেখানে গোরা সৈন্য আছে। দলপতি বলিলেন গোরা আছে, গোরা আছে—তাহাতে কি হইয়াছে? ডাকাতির সংবাদ পঁহুছিলে বিউগেল বাজিবে, পোষাক পরিবার হুকুম হইবে, সাজিবে তারপর কাওয়াজ করিবার পর, মার্চ করিবার হুকুম হইবে, ততক্ষণে আমরা কাজ সাবাড় করিয়া চলিয়া আসিব। দুইখানা নৌকা করিয়া আমরা চুঁচুড়ায় আসিলাম। তীরে উঠিয়া সন্তর্পণে বাটীর ধারে গিয়া বাঁশ পুতিলাম। বাঁশ আমরা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেই বাঁশ দিয়া একে একে আমরা দোতালার ছাদে উঠিলাম। পরে চিলের দরজা ভাঙিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিয়া দেখিলাম দোতালায় মাধব দত্ত ও একটি স্ত্রীলোক শয্যায় নিদ্রিত আছে। আমরা দোর ভাঙিয়া একেবারে ঘরে গিয়া মাধব দত্ত ও স্ত্রীলোকটিকে বাঁধিয়া ফেলিলাম। পরে নীচে আসিয়া দেখিলাম দেউড়িতে একজন লোক পাহারা দিতেছে ও সেখানে আট দশজন পাঠান নিদ্রিত আছে। আমরা পাহারাওয়ালাকে চীৎকার করিলে কাটিয়া ফেলিব বলিলাম। সে কিন্তু আমাদের ধরিবার পূর্বেই পালাইয়া গেল, আমরা পাঠানগুলোকে একে একে বাঁধিয়া ফেলিলাম। তাহারা যোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল—পেটের জন্য আসিয়াছি, প্রাণে মারিও না।...আমি বাহিরে গিয়া সদর দরজায় ঢাল তরবাল লইয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। চক্ষের নিমেষে এই সব কার্য হইয়া গেল। বাড়ীতে লুট চলিতে লাগিল। আমি যখন রাস্তায় এদিক ওদিক ছুটিয়া ঘাটি দিতেছি তখন একজন অশ্বারোহী গোরা আমার দিকে আসিল।...তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটাইলাম ও সাহেব আসিলে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, খবর কি? আমি বলিলাম—খোদাবন্দ সব ঠিক হ্যায়।...যাইবার সময় (সাহেব) বলিয়া গেলেন—"খুব হুঁসিয়ার।" আমিও যথারীতি ঘাটি দিতে আরম্ভ করিলাম। অধিকক্ষণ থাকা আর নিরাপদ নহে বুঝিয়া সংকেত করিলাম। ইতিমধ্যে কার্যও শেষ হইয়াছিল। আমরা বাঁশটি পর্যন্ত তুলিয়া গিয়া নৌকায় চাপিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল।..."

হুগলি জেলারই জলসোরা গ্রাম। কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ মাইল। ১৮৫০ সনের কথা। শহরে পুজোর বাজার সেরে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন জলসোরার বিখ্যাত জমিদার রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গার ঘাটে নৌকো বাঁধা, ফর্দ মিলিয়ে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। এমন সময় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসে নমস্কার করে জমিদার বাবুর সামনে দাঁড়ালেন। রামনারায়ণবাবু তাকে একটি টাকা দিয়ে বিদায় করে দিলেন। যথাসময়ে বদর বদর করে নৌকো ছেড়ে দিল। জলসোরার খালের মধ্যে পড়তে না পড়তে হঠাৎ কোথা থেকে কে জানে, ছিপ চড়ে এসে ডাকাতরা ঘিরে ফেলল জমিদারবাবুর বজরা। ওঁরা সশস্ত্র ছিলেন। গুলি চালালেন। সুতরাং, সুবিধে হল না। ডাকাতরা পালিয়ে গেল। যথাসমারোহে জমিদার বাড়িতে সম্পন্ন হল পুজো। পুজোর পর কালীপুজোর পালা। তারই উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রে জমিদার

বাড়ির ভেতরে শোনা গেল 'হারে-রে-রে' হাঁক! মশাল। ঝাঁক ঝাঁক ডাকাত। জল-সোরার জমিদার বাড়ি লুঠ হয়ে গেল। কিছুই বাঁচাতে পারলেন না ওঁরা। ডাকাতরা সর্বস্ব কেড়ে নিল। জ্ঞান ফেরার পর রামনারায়ণবাবু দেখলেন—তাঁর মাথার কাছে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। তাতে লেখাঃ সেদিন গঙ্গার ঘাটে আপনি গরিব ব্রাহ্মণকে যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা ফেরত দিয়ে গেলাম। সেই সঙ্গে নিয়ে গেলাম আপনার যা কিছু ছিল।

পরে জানা গিয়েছিল এই দুঃসাহসিক ডাকাতির নায়ক ছিল তৎকালের ত্রাস রামঠাকুর। গঙ্গার ঘাটে দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে সে-ই এসে দাঁড়িয়েছিল জমিদারবাবুর সামনে।...

"বাঘে যেমন ঝাঁপ দিয়ারে
গরুর ঝাঁকত্ পড়ে।
মনসুর ডাকাইত পৈড়ল তেমনি
দোলার উপরে॥
দোলার উপর পড়ি ডাকাত
মাইরল এক ডাগ্।
কেহ বলে ভাল্লুক আইল
কেহ বলে বাঘ॥
সোয়ারী ফেলি বেরা
পরাণ লই ধায়।
পালকির দুয়ার খুলি আরে
মনসুর-আলি চায়॥
নয়া বউয়ে কাঁদি উডিল
আল্লা-তালা বলি।
টান মারি লইল ডাকাইত্যা
গলার হাসুলি॥
কানের করম-ফুল লইল
আর নাগর নথ।
তাড়াতাড়ি মনসুর-আলি
ফাল্দি পড়ইল ঝাড়ত॥
বৈরাতীরা ধাইয়া আইল
দোলার কিনারে।
আচানক তবসা দেখি
হায়রে হায় করে॥
দেখিল সগল লোকে
দোলার ভুতর।

নাগর লউয়ে বুগর চুলি
ভাসি যায় বউয়র॥
জোন পহরগ্যা রাইতরে
ওরে দোলা আইল চলি।
বিয়া-বাড়ীর কাঁদা কাডি
দোলার দুয়ার খুলি॥..."

থানার নাম—পাহাড়গড়। গাঁয়ের নাম—সিঙ্গাচোলি। রাত তখন এগারোটা। একদল ডাকাত দেওয়াল টপকে ছাদ বেয়ে হানা দিল তেলীদের বাড়িতে। ওরা বাড়ির বউয়ের ওপর অত্যাচার করল। একজন একটি কুমারী মেয়েকে নিয়ে পড়ল। পাশের বাড়িতেও একটি মেয়ে ইজ্জত খোয়াল। তারপর ওরা মেয়েদের যা সামান্য গয়নাগাটি ছিল তা কেড়ে নিল। যাওয়ার সময় বাড়ির কর্তাকে ওরা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে চলল। বলল—মুক্তিপণ না-পেলে ছাড়া নেই। তেলীরা মোটেই সম্পন্ন গৃহস্থ নয়। মেয়ে পুরুষে মিলে ছয় জনের সংসার। জমি আছে মোটে সাত একর। তাও সে বছর ভাল ফসল হয়নি। বাড়িতে একটা মোষ ছিল। ডাকাতরা বলল—বিক্রি করার মতো আর কিছু যদি না-থাকে তবে এই মোষ বিক্রি করেই টাকার জোগাড় করতে হবে তোদের। মুক্তিপণ আমবা চাই-ই চাই।...

ছোট্ট একটি বাজার। বাজারের গায়েই গাঁ। একশ জনের একটি দল এসে হাজির সেই গাঁয়ে। তাদের প্রত্যেকের পরনে পুলিসের পোষাক। কারও কারও হাতে বন্দুক। তখন রাত হয়নি। ঘড়িতে সবে বেলা চারটে। ওরা গাঁয়ের সর-পঞ্চকে ডেকে পাঠাল। বলল—এই গাঁয়ে ধনী লোক কারা? ছয় জনের একটি দল একজন সোনার; একজন বানিয়া এবং একজন বিড়ি ব্যবসায়ীকে ধরে নিয়ে এল। তাদের ওপর অত্যাচার চলল। কার কোথায় গোপন টাকা রয়েছে ডাকাতদের তা বলতে হবে। মেয়েরা ছাড়া পেল না। একজন ডাকাত সোনারের বউয়ের দিকে হাত বাড়াল। সে বাধা দিতে যাচ্ছিল। অমনি এক কোপ। কপাল কেটে গেল। আহত মেয়েটি চাবির তোড়া ছুঁড়ে দিল। ডাকাতরা বেছে বেছে দশটি বাড়ি লুট করল। ছয় ছয়টি মেয়ে তাদের লালসার শিকার হল। কাজ সেরে এগারো জনকে বেঁধে নিয়ে তারা গাঁ থেকে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল। বন্দীদের মধ্যে দুজন মেয়ে। লুটের তালিকা সেখানেই শেষ নয়। গাঁয়ের ছয়টি বন্দুকও কেড়ে নিল তারা। যাওয়ার আগে পঞ্চায়েতের লোকেদের বলে গিয়েছিল—লিখে রাখ, অমুকের দল হানা দিয়েছিল!

সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তাড়া করে ওদের। ডাকাতরা বন্দীদের ফেলে পালাতে বাধ্য হয়। ওরা সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় অন্য আর একটি গাঁয়ে নয়জন নিরপরাধ মানুষকে খুন করে।...

এমনই সব কাহিনী। প্রথমটি পড়েছিলাম হুগলী জেলার ইতিহাসে

(সুধীরকুমার মিত্র), দ্বিতীয়টি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলার ডাকাত' বইয়ে। তৃতীয় কাহিনীটি পূর্ববঙ্গ গীতিকার 'কাফন চোরের পালা'র। আর শেষ দু'টি ঘটনা চম্বলের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া। নানা হাতে লেখা নানা সময়ের উপাখ্যান। কোনটি দুঃসাহসিকতাপূর্ণ, কোনটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কোনটি আবার নিষ্ঠুরতায় যেন বর্বর-যুগের স্মারক, পাশবিকতায় উন্মত্ত, নিরপরাধের রক্তে রঞ্জিত। বাল্মীকির কাল থেকে ডাকাতি চলছে আমাদের দেশে। নানা ধরনের দস্যুতা। বর্গী, ঠগী, পিণ্ডারী, বাধক, হার্মাদ,—নানাবর্ণের খুনী আর লুঠেরা। এক সময় এই বাংলা মুলুকে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘের মতো জলে স্থলে সর্বত্র ঘুরে বেড়াত ডাকাতের দল। মশাল, মুখোশ, কালিমাখা মুখ, লাঠি, শড়কি, বর্শা, বন্দুক; ডাকাতে কালী, নরবলি, হারে-রে-রে ধ্বনি—বাংলামুলুকে অনেক কাল জুড়ে জনতার অভিজ্ঞতা। ডাকাতের শত শত কাহিনী ছড়িয়ে আছে আমাদের ইতিহাসে, সাহিত্যে, সরকারী দলিলপত্রে, জন-স্মৃতিতে। কোন্ ডাকাত চলন বিলে নিজের অজান্তে খুন করে বসেছিল নিজের মেয়ে-জামাইকে, কার নেশা ছিল দাবা খেলা, কোন্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত কেমনভাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন দুর্দান্ত দুর্বৃত্তের হৃদয়—তার গল্প অনেকেরই জানা। বলতে গেলে বাংলার শিশু সাহিত্যে ডাকাতের গল্প এক বিশিষ্ট ঘরানা। কিন্তু কোথায় সেখানে দ্বিতীয় ভবানী পাঠক?—কোথায়ই বা দ্বিতীয় দেবী চৌধুরাণী? মানি, যদুনাথ সরকারের কথাই ঠিক "প্রকৃত ভবানী পাঠক একজন ভোজপুরী আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ।...ভবানী পাঠক ১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে ইংরাজ সিপাইদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যায়, স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিয়া দ্বীপান্তরে যাইবার পর নহে।" রঙ্গপুরের সরকারী কাগজপত্রকেও মেনে নিতে কোনও আপত্তি নেই। দেবী চৌধুরাণী হয়তো সত্যই প্রফুল্লের মতো গরিব ঘরের মেয়ে নন, হয়তো প্রফুল্লের মতো তিনি স্বামী-পরিত্যক্তাও ছিলেন না। সাহেবরা লিখেছিলেন—তাঁর চৌধুরাণী উপাধি থেকে মনে হয় তিনি একজন জমিদার। হয়তো ছোটখাটো জমিদার। তা না হলে ধরা পড়ার ভয়ে তিনি নৌকোয় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন না। কিন্তু সে-ধরনের অন্য নৌকোই বা কোথায়? অযোধ্যা আরায়, কিংবা বুন্দেলখণ্ড বাঘেলখণ্ডে কি অন্য কোনও ভবানী পাঠক ছিলেন কোনও দিন, তামাম ভারতে অন্য কোনও দেবী চৌধুরাণী?

ডকাত শুধু নিঃশব্দে ইতিহাসের মলিন পাতায় ঘুমিয়ে নেই। আজও প্রতিদিন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নিত্যনতুন ডাকাতের উপাখ্যান। কখনও তাদের আবির্ভাব রেলের কামরায়, কখনও ব্যাংকের দরজায়, কখনও ডাকঘরে, কখনও সড়কে, কখনও বা গৃহস্থ পল্লীতে। আমার সামনে রয়েছে একটি সরকারী খতিয়ান। সেটির প্রকাশক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিবরণটি কিছুটা পুরানো, অর্থাৎ ক' বছর আগের, ১৯৭২ সনের। তবু শোনাবার মতো। এতে বলা হয়েছে ১৯৭২ সনে ভারতে ডাকাতির ঘটনা সংখ্যায়—১০,৩৭৮টি। এ ছাড়াও বড় বড় শহরে সে-বছর আরও ১০৪টি বড় রকমের ডাকাতি হয়েছিল। তদুপরি

আছে পুলিসের পরিভাষায় যাকে বলে "রবারি" তার একটা বিরাট সংখ্যা,—১৭,০৫৪। শুনেছি পাঁচজনের কম, অর্থাৎ দু-চারজন মিলে যখন ডাকাতি করে তখন তাকে বলা হয় "রবারি"। তার কথা বাদ-ই দেওয়া গেল। শুধু ডাকাতির কাহিনীই শুনুন। চিরকালের মতো ১৯৭২ সনেও স্বভাবতই ডাকাতদের হামলা চলে গৃহস্থ ঘরে। বাড়িতে চড়াও হয়ে ডাকাতি করা হয় ৭৯৮৮টি ক্ষেত্রে, পথে হামলা চলে ৬৯৬টি ক্ষেত্রে, রেল ডাকাতির ঘটনা—৮১টি, নদীপথে—৫টি। দেখা যাচ্ছে বোম্বেটেদের দিন ফুরালেও ডাকাতদের দৌরাত্ম্য এখনও ইতিহাসের বিষয় হয়ে যায়নি, ডাকাতরা এখনও দিব্য চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাজ। দেশের কোন্ এলাকায় তাদের দৌরাত্ম্য বেশি তারও বিবরণ রয়েছে খতিয়ানে। এ-ব্যাপারে সকলের আগে উত্তরপ্রদেশ। ১৯৭২ সনে সেখানে ডাকাতি হয়েছে ৪৯০৯টি। বিহারে—২১৪২টি, পশ্চিমবঙ্গে—১৪৬১টি, মধ্যপ্রদেশে—৩৮৭টি, মহারাষ্ট্রে—৪৪৬টি। সবচেয়ে কম জম্মু ও কাশ্মীরে, মাত্র ১টি!

বিপুল সংখ্যক ডাকাতি। ডাকাত দলও, বলাই বাহুল্য, অসংখ্য। এদের মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে নানা দুঃসাহসী, ধূর্ত, এবং বেপরোয়া ডাকাত। দিনের পর দিন তারা পুলিসকে ফাঁকি দিচ্ছে। দরকার হলে লড়াই করছে আইন শৃঙ্খলার প্রহরীদের সঙ্গে। ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে যাচ্ছে দস্যুবৃত্তি। গৃহস্থবাড়ি, দোকানপাট, হাট লুট হচ্ছে। মানুষ মরছে, অপহৃত হচ্ছে। কখনও কখনও হয়তো বা বীরের মতো প্রাণ দিচ্ছে ডাকাতরাও। শান্তির মতো এই বিস্তীর্ণ বিপুল ধ্বংস ক্ষেত্রে হাতে মশাল নিয়ে যদি কেউ খুঁজে ফেরেন তবে কি তিনি সন্ধান পাবেন কোনও জীবানন্দের, কিংবা আমরা কি খুঁজে পাব কোনও ভবানী পাঠক?

চম্বলের বেহেড়ে কত না নাম। মানসিং তোমার, রূপা ব্রাহ্মণ, লাখন সিং, হাজুরি সিং, অমৃতলাল কিরার, গব্বর সিং গুজর, কল্লা, পুতলী, লচ্ছী-শ্রীপাল, পাহারা গুজর, ব্যারেলাল গুজর, পান্না গুজর, বিন্দুয়া আহীর, তান্তিয়া কাচ্চি...আরও কত কে। রাজস্থানে শোনা গেছে জয়সিং, ভাইরস সিং, কিশোর সিং, কল্যাণ সিং, মদন সিং, আখে সিং, কানু ডা, জগমল সিং, ভানওয়ার সিং, কানিয়া, ভোলিয়া, পাল্লুমিয়া ইত্যাদি দুর্ধর্ষ সব ডাকাতের নাম। মরুভূমি, পর্বত—সর্বত্র তাদের পদসঞ্চার। সৌরাষ্ট্রে ছিল ভূপত, লাখু মহারাজ, মানজারিয়া, কাল্লু ওয়াংক, দেবায়েত, রামবাসিয়া এবং আরও অনেকে। হয়তো পুলিসের চোখে প্রত্যেকেই ওরা ছিল এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো। জনসাধারণের চোখে এক ধরনের লৌহমানব, ক্ষিপ্রতায় যারা মৃগ, সাহসিকতায় বাজপাখি, ধূর্ততায় শৃগাল তুল্য। যে দেশে মানুষ অতি শস্তা সে দেশেই ওদের এক একজনের মুণ্ডের দাম হাজার হাজার রুপেয়া! তবু অমিতশৌর্য, প্রভূত পরাক্রম, হননে অকম্পিত হৃদয় এবং বাহুর অধিকারী হয়েও ওরা শেষ পর্যন্ত নিছক ডাকাত মাত্র। ওরা লুঠেরা, ওরা খুনী, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

"ম্যায় ডাকুক্ষেত্র নহী, সাধুক্ষেত্রমে আয়া হুঁ!"—চম্বল উপত্যকায় পেঁছে ঘোষণা করেছিলেন বিনোবা ভাবে। বলেছিলেন—"ইয়ে লোক ডাকু নহী, ইয়ে সব বাগী হ্যায়। ম্যায় ভী বাগী হুঁ!" তাঁর চোখে চম্বলের দুর্ধর্ষ ডাকাতরা কেউ ডাকাত নয়, আসলে তারা বিদ্রোহী। "বাগী" মানে বিদ্রোহী। বিনোবা বিদ্রোহী। বিদ্রোহী ওরাও।

কথাটা মিথ্যা নয়। ডাকু মানেই এক ধরনের বাগী, বিদ্রোহী। শুধু চম্বলে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। তার দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায় সমাজের আর পাঁচজন থেকে সে স্বতন্ত্র। তার পোষাক, তার চালচলন, তার ক্রিয়াকলাপ কোনও কিছুই অন্যের মতো নয়। চীনের দস্যুরা নাকি অন্যদের মতো চুলে ঝুঁটি বাঁধত না, মেক্সিকোর এক ধরনের দুর্বৃত্ত সম্প্রদায়ের পোষাকই পরবর্তীকালে জনপ্রিয় "কাউবয়" ড্রেস। আমাদের দেশেও ডাকাতরা গাঁয়ের অন্যদের মতো আটপৌরে পোষাক পরে না। ওরা পছন্দ করে পুলিস কিংবা সামরিক বাহিনীর লড়িয়েদের উর্দি। এটা কিন্তু নিছক ছদ্মবেশ নয়, ডাকু নিরীহ গ্রামবাসীদের দেখাতে চায় তারা পড়ে পড়ে মার খেতে রাজী নয়, তারা জওয়ানদের মতোই লড়িয়ে এক একজন। গত শতকে উত্তর ভারতে "সানসিয়া" নামে এক দস্যু সম্প্রদায় ছিল। শুধু পোষাক নয়, তাদের দলের সংগঠনও ছিল সামরিক বাহিনীর মতো। কেউ সিপাহী, কেউ জমাদার, কেউ বা সিঁড়ির আরও একধাপ ওপরে।

ডাকু হতে পারে একমাত্র তারাই যারা মাথা হেঁট করতে রাজী নয়, যাদের মেরুদণ্ড সোজা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সে বিদ্রোহী। তার গোঁফজোড়া পর্যন্ত যেন তারই প্রতীক। বুকে টোটার মালা ঝুলিয়ে হাতে রাইফেল নিয়ে গোঁফে পাক দিয়ে সে যখন সামনে দাঁড়ায় তখন আর সব মানুষ তার চোখে যেন মেষ। আর মেষদের চোখে?—বাঘ।—বাগী। বিদ্রোহী।

বিদ্রোহী ওরা নানা কারণে।

চম্বলে নাকি লোকেরা বলে—চম্বল নদীর জল যে একবার খেয়েছে সেই বাগী হয়েছে। গবেষকরা বলেন—মধ্যভারতের ওই এলাকার ইতিহাস, ভূগোল সামাজিক—আর্থিক পরিবেশ ডাকাত তৈরির অতিশয় অনুকূল। শত শত বছর চম্বল উপত্যকা তাই ডাকাতের জননী এবং ধাত্রী। বীরত্বের ঐতিহ্য, লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা, জমির ওপর অত্যধিক চাপ, জমিদারী উচ্ছেদ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ভূমিক্ষয়, গিরিবর্ত্ম,—সব মিলিয়ে চম্বল ডাকাতের এক আশ্চর্য নন্দন-কানন। এখানে সে পরিবেশ বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। যে এলাকায় প্রথম বিদ্রোহী দলকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে, যাচাই করে দেখা গেছে সে-এলাকায় শতকরা দশজন মানুষ এখনও হয় ডাকু, না হয় তার সহযোগী, সহকারী কিংবা পৃষ্ঠপোষক। মুহূর্তে জন্মান্তর। লহমায় এক একজন বাগী সেখানে।

ফতে সিং ডাকাত হল। কেন না, গাঁয়ের আর এক গৃহস্থ কেড়ে নিয়েছিল তার

বত্রিশ বিঘা জমি। ফতে সিং প্রথমে প্রতিবাদ করল। তারপর প্রতিরোধের চেষ্টা। কিন্তু প্রতিপক্ষ বলবান। তারা পিস্তল চুরির সাজানো মামলায় পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিল তাকে। ছাড়া পেয়ে ফতে সিং খুন করল। তারপর বাগীর বেশে হারিয়ে গেল বেহেড়ে, চম্বলের গোলকধাঁধায়। বিখ্যাত দস্যুদলপতি বলবন্তও ডাকাত হয়েছিল এই জমির জন্যই। পান্না সিং, শোভা সিং, রাজু— অনেকেরই একই উপাখ্যান। বিরোধের উপলক্ষ জমি,—মাটি। কথনও অতি তুচ্ছ— গরু। কারও গরু হয়তো অন্য কারও জমির ফসল খেয়েছিল, তাই নিয়ে খুনো-খুনি। তারপর রাইফেল হাতে ফেরারীর জীবন।

গ্রামের দলাদলি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জাতিপাঁতি নিয়ে বিরোধ, বর্ণ-বিদ্বেষ—এসব কারণেও ডাকাত হয়েছে অনেকে। নিগ্রহ বা অপমানের প্রতিশোধ নিতে বেছে নিয়েছে দুর্বৃত্তের কঠোর কঠিন জীবন। প্রতিশোধ চাই!—সকলের মনের কথা যেন এটাই। খুন কা বদলা খুন!—প্রত্যেকের মনে মনে শঙ্খধ্বনির মতো নিনাদিত এই শ্লোগান। রাজপুত মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশোধে উদ্দীপিত করে তোলেন আপন পুত্র স্বামী অথবা ভাইকে।

চৌদ্দ বছর কারাবাসের পর জেলেই মারা গেল শের সিংয়ের বাপ। মা ছেলেকে ডেকে বলল—এ মৃত্যুর প্রতিশোধ চাই। শের সিং তার ভাইকে নিয়ে যোগ দিল ডাকাত দলে। বিখ্যাত দস্যু মান সিং তোমার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তলফিরাম ব্রাহ্মণের ওপর। কেন না, সে তাকে মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়েছিল। এগারো বছর পরে গাঁয়ে ফিরে এসেছিল মানসিং। ইতিমধ্যে তার দুই দুইটি ছেলে নিহত। তারপরও হয়তো অন্যরকম হতে পারত মান সিংয়ের জীবন। কিন্তু বদলা নিতে প্ররোচিত করেছিল স্ত্রী রুক্মিণী। বলেছিল চোখের জল রাজপুতকে মানায় না। নিজের অন্য ছেলেদের নিয়ে "বাগী" হয়েছিল মান সিং তোমার।

"বাগী" হয়েছে কেউ কেউ মেয়েদের ইজ্জতের প্রশ্নেও।

হোতাম সিংয়ের একটি বোন ছিল। বয়স তার ষোল। জেন্দা সিং গাঁয়ের মস্তান যুবা। একদিন মেয়েটিকে বাগে পেয়ে সে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করল। জেন্দার বাবা প্যাটেল ফুল সিং। সম্পন্ন ব্যক্তি। হোতাম সিং তার কাছে গিয়ে বিচার চাইল। ফুল সিং অপমান করে তাড়িয়ে দিল তাকে। হোতাম সিং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল প্রতিশোধ নেবে। বহু কষ্টে সে একটি বন্দুক কিনল। ফুল সিং পুলিসকে উস্কে দিল। ওরা বন্দুকটি কেড়ে নিল। হোতাম সিং কিছুদিন চুপচাপ রইল। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে বাপ বেটা দুজনকেই খুন করল। তারপর ওদের দলের আরও তিনজনকে। সে খুনী। সে ডাকাত।

প্যাটেল আনন্দী সিং বড় জমিদার। গুজর ব্যারেলাল সাধারণ কৃষক। গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণের বউ তাকে ভালবাসে। একদিন ধরা পড়ে গেল ওরা। জমিদারবাবু ব্যারেলালের বিচার করলেন। দড়িতে বেঁধে ব্যারেলালকে ঝুলিয়ে

রাখলেন একটা কুয়ায়। অবৈধ ভালবাসার জরিমানা হিসাবে কেড়ে নিলেন তার জমিজমা। ব্যারেলাল তার প্রতিশোধ নিল ডাকাত হয়ে। চম্বলের অন্যতম দুর্ধর্ষ ডাকু সে।

প্রেম সিং শিওপুরের জমিদারের ছেলে। প্রেমা নামে একটি মেয়েকে একদিন সে জোর করে ভোগ করে। লজ্জায় অপমানে আত্মঘাতী হল বেচারী প্রেমা। তার একটি ভাই ছিল। তখন বয়স তার মাত্র দশ বছর। দিদির অপমানের কথা ভুলতে পারে নি সেই কিশোর। বয়স যখন তার সবে আঠারো তখন প্রেম সিং খুন হল তার হাতে। তার মুণ্ড হাতে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করল বিজয়ী তরুণ· তারপব ঝাঁপ দিল দস্যু জীবনে।

এমনই সব নেপথ্য-কাহিনী। বিদ্রোহের উপলক্ষ হয়তো সকলের এক নয়, কিন্তু প্রত্যেক ডাকাতেব পেছনেই আছে কোনও না কোনও কারণ, সামনে কিছু না কিছু উপলক্ষ। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, গরু জরু, বিষয়-আশয়—অনেক কিছুই ডাকাত গড়ে। ডাকাত গড়ে এমন কি অনেক সময় আইন শৃঙ্খলার প্রহরীদের ভ্রান্ত নীতি। চম্বলে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের ইতিবৃত্ত রয়েছে। সে ডাকাতের জীবন বরণ করে নিয়েছিল নাকি শুধু পুলিসের অত্যাচারে।

কার্য-কারণ যাই হোক না কেন, অবশিষ্ট সমাজের চোখে ওরা সমাজ-বিরোধী দস্যু মাত্র। কেউ ওরা ভবানী পাঠক নয। নয রবিনহুড। না, বোধ হয় এমন কি মান সিংও না।

মান সিং তোমার চম্বলের প্রবাদপুরুষ। জনতার চোখে সে নাকি রাজা-মান সিং। তার নামে রচিত হয়েছে ছড়া, গান। সবই মান সিং-য়ের বন্দনা সংগীত। সে প্রতিদিন সকালে নিষ্ঠাভবে পুজো কবে। ভগবান ছাড়া আর কারও কাছে মাথা হেঁট করে না সে। গাঁয়ের মানুষের চোখে মান সিং অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি। কারও বাড়িতে সে পায়ের ধুলো দিলে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। কোনও বিয়ের আসরে মান সিং হাজির হলে আসর উজ্জ্বল হয। মান সিং দরিদ্রকে দান করে। অথচ ধনীর কাছে সে বিভীষিকার মতো। তার ভয়ে পুলিস পর্যন্ত ভযে কাঁপে। তবু মান সিং কিন্তু ভবানী পাঠক হতে পারল না। বড়জোর সে একজন অ্যাডেঞ্চার, প্রতিশোধ-স্পৃহায় উন্মত্ত দুঃসাহসী দুর্বৃত্তমাত্র। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান—দীর্ঘ দুই দশক ধরে চার এলাকা তছনছ করে ফিরেছে সে শুধু বদলা নেওয়ার জন্য। কুড়ি বছরে অন্তত ১৮৫ জনকে খুন করেছে সে, ছোট বড় ডাকাতি করেছে ১১১২টি, পুলিসের সংগে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছে ৮০ বার। তার হাতে পুলিস মরেছে ৩২ জন।

মান সিং, সন্দেহ নেই, দস্যু-রাজ। কিন্তু সত্যিকারের সামাজিক-ডাকাত নয় সে। সে ভবানী পাঠক নয়, আনন্দমঠের সন্তানদের মতো তার সামনে কোনও লক্ষ্য নেই।

সে লক্ষ্য ছিল না এমন কি সৌরাষ্ট্রের বিখ্যাত দস্যুদলপতি ভূপতের

সামনেও। হঠাৎ মনে হতে পারে সেও বুঝি মান সিংয়ের মতো রবিনহুডের কোনও দূর সম্পর্কের ভাই। হয়তো বা আরও বেশি,—বুঝি বা ভবানী পাঠকের সঙ্গেও তার আত্মীয়তা। কিন্তু তাই কি ? একবার তাকিয়ে দেখা যাক মানুষটিকে।

ভূপত সৌরাস্ট্রের বাগী। অতীতের কাথিয়াবাড়ের বিখ্যাত দস্যুদের সার্থক উত্তরাধিকারী সে। শোনা যায়, স্বাধীনতার আগে সৌরাষ্ট্রের দু'শ দেশীয় রাজ্যের কোনও একটিতে রাজবাড়িতে কাজ করত সে। ছোটখাটো রাজা। ভূপত তাঁর ওখানেই মোটর চালাতে শেখে। শেষে বন্দুক চালাতে। ১৯৪৭ সনে জুনাগড় উপলক্ষে সৌরাষ্ট্রে যখন "আরজি হুকমত" শুরু হয় তখন নাকি তাতে যোগ দেয় সে। বয়স তখন তার মাত্র ছাব্বিশ বছর। কেউ কেউ বলেন ভূপত ছিল সে আন্দোলনে রীতিমত একজন নেতা। কিন্তু পুলিস বলে ওসব বাজে কথা, আসলে মোটর চালনার টুকিটাকি কাজ করত সে, স্বেচ্ছাসেবকরা যেমন করে। তারপর কেমন করে যে কী হল, ভূপত খুনী হল। খুনী এবং লুটেরা। তার প্রথম খুনের তারিখ ১৪ জুলাই, ১৯৪৯। তারপর ক্রমাগত খুন আর খুন। ডাকাতি আর ডাকাতি। ১৯৫৯ সনের জুনের মধ্যে সৌরাষ্ট্রে ৩৪টি বড় রকমের অপরাধের নায়ক সে। ৪৯ জন খুন হয়েছে তার হাতে, লুট করেছে কমপক্ষে ১ লাখ টাকা ! ভূপতের মাথার দাম ধার্য হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা।

সৌরাষ্ট্রের নানা প্রবাদ তার সম্পর্কে। যথাঃ ভূপত অতিশয় ধার্মিক। সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে অদৃশ্য হতে পারে। মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে পারে হাওয়ায়। খাড়া পাহাড় যেন তার কাছে সোজা পথ। তরতর করে সে উঠে যেতে পারে সে-পাহাড়ের মাথায়। বর্ষার শুভ মাসগুলোতে ভূপত অহিংস-ব্রত উদ্-যাপন করে, তখন কাউকে সে খুন করে না। বাচ্চাদের সামনে পেলে সে মিঠাই খেতে পয়সা দেয়। মেয়েরা তাকে বাপের মতো শ্রদ্ধা করে। ভূপত বিপদে পড়লে যথাসাধ্য তারা সাহায্য করে। একবার পুলিস ধাওয়া করেছিল ওকে। ভূপতের দল সামনে একটা গরুর গাড়ি দেখে লাফিয়ে তাতে উঠে পড়ে। সে-গাড়িতে ছিল একদল গাঁয়ের মেয়ে। নিজেদের ঘাঘরার তলায় তারা নাকি লুকিয়ে রেখেছিল ডাকাতদের ! এমনই সব কাহিনী।

তবে পুলিস কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেন ভূপতের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সে মেয়েদের সম্মান করে চলত। তার দল কখনও কোনও নারী-নিগ্রহের ঘটনায় জড়ায়নি। ভূপতের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল পুলিসের বড়কর্তাকে নিয়মিত চিঠি লিখত। কখনও আগে ভাগে জানিয়ে দিত তার মতলব। একবার পুলিসের হাতে তার দলের একজন মারা যাওয়ার পর ভূপত পুলিস-প্রধানকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিল—আমার একজন সঙ্গীকে মারার জন্য তুমি পুলিসকে পুরস্কার দিয়েছ পঞ্চাশ টাকা ! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। ভূপত তোমার সঠিক খবর এনে দিয়েছিল বলে একজনকে কত পুরস্কার দিয়েছে জান ?—দু হাজার টাকা ! একবার তার এক স্বপ্নের কথা লিখে পাঠিয়েছিল পুলিসকে।

সে স্বপ্ন-কথায় পুলিস সম্পূর্ণ পরাজিত, বিজয়ী ভূপত। আর একবার এক বাড়িতে ডাকাতির পর নিজেদের একটি গ্রুপ ফটো রেখে গিয়েছিল ভূপত। সঙ্গে ছোট্ট নোট,—রেখে দিও, তোমাদের কাজের সুবিধা হবে! তার গুলির তহবিল কমে এলে, কিংবা দলে ভাঙ্গন ধরলে তাও চিঠি লিখে নিঃসংকোচে পুলিসকে জানিয়ে দেয় ভূপত। শেষ দিকে সে রাজনৈতিক ভঙ্গীও গ্রহণ করেছিল। ১৯৫২ সনের নির্বাচনে ইস্তাহার ছাপিয়ে আহ্বান জানিয়েছিল—কংগ্রেস রাজকে দূর কর। ওরা আমাদের চেয়েও ডাকু। ওদের বাক্সে একটি ভোটও যেন না পড়ে। যদি পড়ে, তবে তোমাদের রক্ষা নেই! মুখ্যমন্ত্রী ডেবর-এর নির্বাচনী সভায় গুলি চালিয়ে দশজনকে হত্যা করেছিল সে। তবু, বলাই বাহুল্য, বিজয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। কেননা, জনসাধারণ জানত—ভূপত কাজ করছে তাদের জন্য নয়, রাজরাজড়াদের পুরানো হুকমত ফিরিয়ে আনার জন্য। নির্বাচনের পরে ১৯৫২ সনের জুনে পাকিস্তানে পালিয়ে যায় সে। তার হাত তখন ৮৭টি মানুষের রক্ত মাখা!

না মান সিং, না ভূপত—সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দুজনের কেউই সত্যিকারের সামাজিক-ডাকাত হতে পারল না। সবাই পারে না। সে-ডাকাতের চরিত্র লক্ষণ অন্যরকম। সেসব লক্ষণ মিলিয়ে দেখলে শুধু ভবানী পাঠক কেন, খুঁজে পাওয়া শক্ত দেবী চৌধুরাণীকেও।

পুতলীও দস্যুরাণী। সত্যি বলতে কি, চম্বলের এই মেয়েটির মতো দুর্ধর্ষ নারীদস্যু ইতিহাসে বোধহয় কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। দস্যুর ভূমিকায় বিশ্বের অন্যত্রও কখনও কখনও দেখা গেছে মেয়েদের। পেরুতে এই শতকেই আবির্ভূত হয়েছিল রোজা পালমা, বারবারা রামস, এবং আরও একটি মেয়ে। তারা পুরুষের ছদ্মবেশে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ডাকাতি করে ফিরত, তাদের হাতের বন্দুকের নিশানা ছিল অব্যর্থ। গত শতকের আন্ডালুসিয়ায় দেখা গেছে জাফ্রা নামে এক দুর্দান্ত নারী দস্যুকে, পুরুষকে নানাভাবে নিগ্রহ করাই নাকি ছিল তার ব্রত। এ-ব্যাপারে একমাত্র নিষ্ঠুরতম পুরুষ দুর্বৃত্তের সঙ্গে তার তুলনা কিন্তু এরা ব্যতিক্রম। সাধারণত ডাকাতের জীবন মেয়েদের জন্য নয়। কখনও কখনও দলে যোগ দিলেও তাদের ভূমিকা সাধারণত দলপতির রক্ষিতা কিংবা প্রেমিকার। ব্রেজিলের দস্যু সর্দার লাম্পিওর প্রেমে পড়ে দলে যোগ দিয়েছিল জনৈক রূপসী, মারিয়া বোনিটা। সে আড্ডায় বসে সূচের কাজ করত, রাঁধত, নাচত। দলের সঙ্গে ফিরত কিন্তু খুনোখুনিতে মাততে দেখা যায়নি তাকে। পুতলী কিন্তু এই মেনি বেড়ালের জীবন মেনে নেয় নি। সে বাঘিনী।

বাঈজীর মেয়ে বাঈজী পুতলী ডাকাতের দলে যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছায় নয়, ঘটনাক্রমে। ঢোলপুরে এক গানের আসর থেকে ডাকু সুলতান অতর্কিতে তুলে এনেছিল তাকে। নতুন কোনও ঘটনা নয়। ফেরারী দস্যুরাও কখনও কখনও নারীসঙ্গের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওদের তৃপ্ত করে সাধারণত বারবনিতারা।

কখনও কখনও ওরা নগদের বিনিময়ে গরীবের মেয়ে কিনেও নেয়। চম্বলে বেলা নামে একটি মেয়েকে দু হাজার টাকায় সাংকরার দলের কাছে বেচে দিয়েছিল তার শ্বশুর। কখনও বা ওদের লালসার আগুনে পুড়ে মরত বিয়ের কনে। ভালবাসাবাসির ব্যাপারে যারা বুদ্ধিমান এবং ভাগ্যবান তারা কাছাকাছি গাঁয়ে পারিবারিক বন্ধু হিসাবে দিব্যি দিন কাটাত। ফতে সিং এমনই আমোদের এক আসর খুঁজে পেয়েছিল নাকি একটি গাদারিয়া পরিবারে। বিখ্যাত ডাকাত অমৃতলালের এক শিবপুরী জেলাতেই নাকি বান্ধবী ছিল এগারোজন। অমৃত-লল তবু নতুন নতুন মেয়েমানুষের জন্য পাগল। তার মৃত্যুর কারণও এই নেশা। দলের তরুণ বদরীর বোনের দিকে নজর দিয়েছিল সে, আর তার বদলা নিয়েছিল বদরী আপন দলপতিকে হত্যা করে। এসবের বদলে সুলতান বেছে নিয়েছিল অন্য পথ। বাজপাখির মতো তার স্বপ্নের পরীকে সে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল চম্বল উপত্যকার অসংখ্য গুহার কোনও একটিতে।

তারপরের কাহিনী আজ সকলের জানা। পুতলী ভালবেসেছিল সুলতানকে। সুলতান পুতলীকে। পেটভরা ভালবাসা। সুলতানের সন্তানকে কোলে ধারণ করেছে পুতলী। লোকালয়ে ফিরে এসেও আবার ফিরে গেছে তার কাছে। সে-অলো-আঁধারি জীবনে বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা। ঈর্ষা, বাঁধভাঙা কামনা, গোপন শত্রুতা—সবই দেখেছে পুতলী। দেখে দেখে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে। সুলতানের মৃত্যুর পর সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে তার শত্রুকে। কাল্লাকে। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছে দলের শত্রু পুলিসের সঙ্গে। পুতলী যখন পুলিসের হাতে নিহত হয় তখন তার একটি হাত কাটা। তবু এক হাতেই সেদিন নাকি সে দুর্ধর্ষ লড়িয়ে!

চম্বলের ইতিহাসের পাতা উলটাতে উলটাতে হঠাৎ আরও একটি মেয়ের মুখোমুখি। তার নাম—চামেলি। যেন পুতলীরই কোনও বোন। মোটামুটি একই জীবন তার। বুঝিবা আরও চাঞ্চল্যকর। নাম যদিও তার চামেলি, সে পুষ্পমাত্র নয়। অনাঘ্রাতা পুষ্পও নয়। চামেলি ছিল নাকি বারবনিতা। সেও নর্তকী। সে ভালবেসেছিল সুন্দেরা ডাকাতকে। কিন্তু পুষ্পকন্যা হয়েই থাকেনি সে। চামেলি ডাকু, চামেলি খুনী, সুন্দেরার পর, যোগ দিয়েছে অন্য ডাকুদের সঙ্গে। এক-জনকে পতিত্বে বরণ করেছে, অন্যদের দিয়েছে সহকারী এবং সেবায়েতের ভূমিকা। একের পর এক ডাকাতি করেছে সে, খুন করেছে, মানুষকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে নিজেদের আস্তানায়। এমনকি মেয়েদেরও রেহাই দেয়নি সে। পরিবারের আশ্রয় থেকে তরুণী মেয়েকে কেড়ে এনে তুলে দিয়েছে যৌন ক্ষুধায় কাতর দস্যুদের হাতে। ওদের কান্না নাকি চামেলিকে আনন্দ দিত। চামেলি পাষাণ প্রতিমা। বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয় চামেলি তার এই জীবনের জন্য। বরং রীতিমত গরবিনী সে। নাহার সিং সুন্দেরার দল ছেড়ে যে বেরিয়ে গেল সে-নাকি তারই জন্য। চামেলি নাকি নাহারকে বলেছিল—তোর মতো ঠাকুর, আমার চপ্পল

পালিশ করে!

সন্দেহ নেই এরাও বিদ্রোহিনী। কিন্তু কেউ নয় দেবী চৌধুরাণী। অবশ্য দেবী চৌধুরাণী বলতে এখানে আমরা বজরানিবাসিনী দুর্ধর্ষ ডাকাতের-রাণীকেই বোঝাচ্ছি, রাণীগিরি যার কাছে ঝকমারি তাকে নয়। 'দেবী মরিয়াছে' বলে ঘোষণা করে যে ডাকাতের রাণী স্বামীর পিছু পিছু আবার ঘরে ফিরে এসেছিল তাকেও নয়। দেবী চৌধুরাণী মানে ভবানী পাঠকের আদর্শে গড়া দস্যু নারী, সত্যিকারের ভবানী পাঠকের মতোই শেষ পর্যন্ত যিনি সংগ্রামী। আজকের বিচারে যাঁরা নিছক দস্যু নন, তার চেয়ে বেশি কিছু।

এঁরা ছিলেন সামাজিক-ডাকাত। যারা লোকেদের ওপর হামলা করে, জবর-দস্তি করে কেড়ে নেয় তাদের ধন-সম্পদ, আইনের চোখে সবাই তারা ডাকাত। এ-ব্যাপারে শহর আর গ্রামের ডাকুর মধ্যে পেনালকোড কোনও ভেদাভেদ জানে না। মানে না। ঐতিহাসিকের চোখে সবাই কিন্তু এক নয়। (প্রসঙ্গত স্মরণীয় আমাদের দেশের স্বদেশী-ডাকাতদের কথাও।) কেন না, দেখা গেছে এমন ডাকাতও আছে সমাজের চোখে যারা আদৌ কোনও অপরাধী নয়, বরং প্রিয়জনের মতো। শহরে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা ঘোরা ফেরা করে গ্রামাঞ্চলে,—কৃষক সমাজে। সেখানেও দু'ধরনের ডাকাত থাকতে পারে। একদল নিছক সমাজ-বিরোধী। তারা চাষীদের ওপর হামলা চালাতে ইতস্তত করে না। লুঠবার মতো ভাণ্ডার পেলেই তারা লুঠে নেয়, না পেলেও একেবারে খালি হাতে ফিরে যেতে চায় না। অন্যদিকে সত্যিকারের সামাজিক ডাকুর সংকল্প—মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। তারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়, অন্যায়কে প্রতিরোধ করে, লুটের ধন ভোগ করে গাঁয়ের গরিবদের সঙ্গে মিলে। গাঁয়ের জমিদার জোতদার, তথা সম্পন্নদের চোখে তারা অপরাধী কিন্তু গরিবের চোখে 'হিরো', দেবতুল্য মানব সব,—বন্দনাযোগ্য।

ই. জে. হবসবাম এদের নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন—বিশ্বের সর্বত্র ওরা ছিল। এশিয়ায়, ইউরোপে, আমেরিকায়—ডাকুর মতোই সামাজিক-ডাকুও বলতে গেলে এক সর্ব-দেশীয় প্রাণী। তার চরিত্র লক্ষণ সর্বদেশে এক। তিনি সামাজিক ডাকুকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে। এক—মহৎ-দস্যু বা রবিন-হুডরা। দ্বিতীয়—'হাইডাক', বা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কৃষক গেরিলা-লড়িয়েরা। তৃতীয়—পবিত্র ঘৃণায় প্রজ্জ্বলিত প্রতিবাদীরা।

প্রথমে রবিনহুডদের কথাই ধরা যাক। কেননা, ওরা সুপরিচিত। চম্বলের মান সিং বা সৌরাষ্ট্রের ভূপতকে যদি আমরা রবিনহুডের ছাঁচে গড়া বলে মেনে নিতে রাজী নাও হই আমাদের ঘরের বিশে ডাকাত বা রঘু ডাকাত কিন্তু জনমনে রবিনহুডেরই ছায়ার মতো। সবাই জানেন, সে-ছায়া কায়া ধরে একদিন সত্যিই ঘুরে বেড়াতো এই বাংলায়।

বিশে ডাকাত ডুমুরদহের বিখ্যাত বিশ্বনাথ রায়। ডাকাত হয়েও তিনি

ছিলেন বিশ্বনাথবাবু। জলপথে বাংলার সর্বত্র নাকি আনাগোনা ছিল তাঁর। অত্যাচারী ধনীরা তাঁর ভয়ে কম্পমান। বিশ্বনাথবাবুর এক বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি বিনা নোটিশে ডাকাতি করতেন না। আর ডাকাতির ধন দু'হাতে বিলিয়ে দেওয়াতেই নাকি ছিল তাঁর আনন্দ। ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি—কীভাবে তিনি এক দরিদ্র বিধবার উপকার করেছিলেন। বিশ্বনাথ যশোহরে এক ধনীর বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে দেখেন ভদ্রলোক সপরিবারে উধাও। বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন তাঁদের এক বিধবা আত্মীয়া। বিশ্বনাথকে দেখে তিনি যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন—আজ রাত্তিরে বাবা তুমি এখানে থেকে যাও। আমি বিশে ডাকাতের কথা ভেবে খুবই ভয় পাচ্ছি। 'হো হো' করে হেসে উঠেছিলেন বিশ্বনাথবাবু। বলেছিলেন—আমিই তো বিশে ডাকাত। মেয়েটি কিছুতেই তা বিশ্বাস করবে না। শেষ পর্যন্ত বিশে ডাকাত যেন বিধবার হারানো ছেলের মতো।

এমনই সব গল্প। রঘু ডাকাতের গল্প সব আরও রোমাঞ্চকর। তার দলে ছিল 'শিকারী' নামে একদল 'বুনো'। রঘুর সত্যিকারের ঠিকানা কী, কেউ নাকি আজও তা জানে না। মনে হয় চব্বিশ পরগণা জেলাই ছিল তার কাজকর্মের এলাকা। বিশ্বনাথের মতো সেও পরোপকারী। অসহায় গৃহস্থকে টাকা দিয়ে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে সে। দারোগা দুর্গাচরণের বাড়ি ডাকাতি করে সে লিখে রেখে যায়—যা পেলাম তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-ধরনের আরও অনেক ডাকাতের কথা আছে বাংলার ডাকাতদের কাহিনীতে। কেউ তারা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে, কেউ পুকুর কাটায়, কেউ বা নিয়মিত দান খয়রাতি করে। ডুমুরদহের বিশ্বনাথের ফাঁসি হয় ১৮১৮ সনেরও আগে। তার কয়েক দশক পরে রিষড়ায় আবির্ভূত হয়েছিল আর এক বিশ্বনাথ। সেও হিত-কারী দস্যু। গ্রামের মানুষ বিনা চিকিৎসায় মহামারীতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে দেখে সে জোর করে ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নেয়। নীলকরের অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য হামলা চালায় সাহেবদের সহযোগী জমিদারদের ওপর। সাহেবের গুলিতে এই বিশ্বনাথ মারা যায় ১৮৫১ সনে। "সমাচার দর্পণে" জনৈক পত্রলেখক সেজন্য সাহেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাহেবের নামের আগে বিশেষণ জুড়েছেন তিনি "অখণ্ড প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডবৎ দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত দেশহিতৈষী সদগুণরাশি বিপুল সাহসী দস্যুন্বেষী সুবিজ্ঞ সুচতুর শ্রীযুক্ত।" কিন্তু ক'জনের আজ মনে আছে শ্রীরামপুরের সেই জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নাম? অথচ, বিশ্বনাথেরা কিন্তু লোকমুখে বেঁচে থাকে শতকের পর শতক। রবিন হুড নামে আদৌ কোনও দিন কেউ ছিল কিনা সে-বিষয়ে অনেক গবেষকের সন্দেহ। থাকলেও ছিল হয়তো খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে। ইতিমধ্যে অনেক রাজা এসেছেন গিয়েছেন, তলিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। কিন্তু এখনও বেঁচে আছে রবিনহুড। কারণ সে—মহৎ ডাকু, বিশে বা রঘু যেমন।

বাঙালী কুলীন বা 'বাবু'র মতো মহৎ ডাকুরও নবধা লক্ষণ। অন্তত হবস-

বাম-এর তা-ই অভিমত। প্রথমত—সে অপরাধ করে ফেরারী নয়। অর্থাৎ সে নয় সাধারণ খুনী বা তস্কর। দ্বিতীয়ত—সে অন্যায় করে না, অন্যায়কে শুধরায়। সে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তৃতীয়ত—সে ধনীর কাছ থেকে কেড়ে এনে গরিবকে দেয়। গরিবের ভাণ্ডারের দিকে সে কখনও হাত বাড়ায় না। চতুর্থত—সে যদৃচ্ছ খুন করে না। করে একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। পঞ্চমত—কাজ শেষ হয়ে গেলেই সে আবার ফিরে আসে নিজের সমাজে। সম্মানিত নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকাই তার ইচ্ছা। ছয়—সমাজের দরিদ্ররা এবং অত্যাচারিতরা তাকে সমর্থন করে, সাহায্য করে। সাত—প্রতিপক্ষের সাধ্য নেই তাকে হার মানায়। সাধ্য নেই তাকে হত্যা করার। একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতাই হতে পারে তার মৃত্যুর কারণ। অষ্টম লক্ষণ—জাদুকরের মতো ক্ষমতা তার। ইচ্ছা করলে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সে-কারণেই সে অবধ্য। তার নবম লক্ষণ—সে মূলত রাজদ্রোহী নয়, বিদ্রোহ তার স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধেই।

এসব কুলচিহ্নের ছিটেফোঁটা হয়তো আজকের কোনও কোনও দস্যু সর্দারের ললাটেও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সব নয়। কেননা, রবিনহুডরা বিশেষ কালের বিশেষ সমাজের সন্তান। সে-কালসীমা পেরিয়ে আসার পর স্বতঃই তারা সুদুর্লভ। ইউরোপে সামাজিক-ডাকুদের কাল ছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ থেকে আঠারো শতক। অন্যত্র কোথাও উনিশ কোথাও বা বিশ শতক। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের 'হাইডাক'রা বলতে গেলে প্রতিরোধ চালিয়ে গেছে পনের শতক থেকেই। হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, জার্মানী, রাশিয়ায়—যুগের পর যুগ তাদের বীরত্বপূর্ণ কাণ্ডকারখানা। ওদের চোখে তলোয়ার ছিল ওদের বোন, রাইফেল স্ত্রী, আর বিয়ে—মৃত্যু!

ওদের কথা থাক। অন্যদের কথাই বলি। রবিনহুড্‌দের কথা। আগেই বলা হয়েছে সামাজিক-ডাকু কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজের ফসল। সামাজিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন তাদের আবির্ভাব ঘটে সাধারণত যুগান্তরের ঊষাকালে। আদিম উপজাতির কৌম সমাজ যখন আধুনিক ভূমি ব্যবস্থার আওতায় আনার চেষ্টা হয় তখন যেমন ডাকু সাজতে পারে কেউ কেউ ঠিক তেমনি কৃষি সমাজ যখন শিল্পায়নের পথে পা বাড়ায় তখনও তাদের আবির্ভাব সম্ভব। এই উত্তরণের কালে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, কিংবা নৈরাজ্য—সামাজিক-ডাকুর পক্ষে বিশেষ অনুকূল পরিবেশ। সুতরাং, সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে রবিনহুডকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৮৬১ সনে দাসপ্রথা বিলোপের পর রাশিয়ায়ও আগেকার চেহারায় খুঁজে পাওয়া যাবে না 'হাইডাক' বা ওদের কসাক দস্যুদের। আর তা-ই যদি হয় তবে চম্বল বা রাজস্থানের গুহায়ই বা কেমন করে আমরা খুঁজে পাব ভবানী পাঠক কিংবা দেবী চৌধুরাণীকে? এমন কি রঘু বা বিশে ডাকাতকেও বোধ হয় ঊনবিংশ শতকের বাংলায়ই মানায়,—অন্য সময়ে নয়, অন্য কোথাও নয়।

ভবানী পাঠকের কাল, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ ক'টি দশকের রাষ্ট্রীয়

বিপর্যয় এবং নৈরাজ্যের কথা আজ সকলের জানা। যদুনাথ সরকার লিখেছেন—সে-অমাবস্যার বিস্তার পলাশীর যুদ্ধ থেকে হেস্টিংস-এর শাসন সংস্কার পর্যন্ত ষোল বছর। কিন্তু আমরা জানি, ঈষৎ অন্য চেহারায় হলেও যুগটা আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। নয় তো ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত দেশে হঠাৎ হঠাৎ এখানে ওখানে আগুন জ্বলে উঠত না। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের শান্তিবারি নিক্ষেপের পরই জুড়িয়ে যেত সকলের সব জ্বালা যন্ত্রণা। ‘অথচ এই একশ' বছরের মধ্যে বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ। বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ পেয়েছেন—উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী ফকিরদের বিদ্রোহ যেমন নিছক লুঠেরার উপাখ্যান নয়, তেমনই ভবানী পাঠক কিংবা দেবী চৌধুরাণীও নন নিছক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। ফকিরদের নায়ক মনজুর সঙ্গে সত্যই যোগাযোগ ছিল সন্ন্যাসী নায়ক ভবানী পাঠক এবং বিদ্রোহিণী দেবী চৌধুরাণীর। ভবানী পাঠক প্রায়শ্চিত্ত করতে স্বেচ্ছায় দ্বীপান্তরী হননি। ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই ১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই কি শেষ ‘দস্যু’? তাঁর মতো দস্যু কি পরবর্তীকালের নানা বিদ্রোহে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত?

তেমন করে খুঁজলে আরও অনেক ভবানী পাঠকই বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের মহাফেজখানাগুলোতে। তাঁরা কখনও হয়তো ফাইল বন্দী হয়ে আছেন সমাজবিরোধী ডাকাতদের সঙ্গে, কখনও হয়তো বা মিশে গেছেন বিদ্রোহী জমিদার আর তাঁর অনুগত প্রজাদের ভিড়ে। ঘাটশিলার জমিদার বা ধলভূমের রাজার ঐতিহাসিক বিদ্রোহে (১৭৬৯-৭৪)—কে ওই দুঃসাহসী দামোদর সিং, যিনি বলেন—এই এলাকায় ফিরিঙ্গীর কোনও ঠাঁই নেই? সাহেবরা কিন্তু বার-বার লিখেছেন—তিনি একজন দস্যু-সর্দার!

জমিদার যেমন দস্যু হতে পারেন, কোনও কোনও দস্যুও তেমনই আপৎকালে হাত মিলাতে পারে স্থানীয় সামন্ত প্রভুর সঙ্গে। ইউরোপের ‘হাইডুক'রা তাই করেছে। উনিশ শতকেও দেখা গেছে মেসিডোনিয়ায় দস্যু দলপতি কোট্টা ক্রিসটভ প্রথমে লড়াই করেছে তুর্কীদের সঙ্গে, তারপর হাত মিলিয়েছে স্থানীয় বিপ্লবী-দের সঙ্গে, অবশেষে গ্রীকদের সঙ্গে। নিজ এলাকার স্বার্থই তার কাছে সকলের আগে। কিউবার গুরসিয়াও (মৃত্যু ১৮৯৫) নাকি যোগ দিতে চেয়েছিল দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। চীনে লড়াইয়ের প্রথম পর্বে মাও সে তুং তাদের ঠাঁই দিয়েছিলেন—লালফৌজে। ডাকাতকে অতএব নিছক ডাকাত বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই।

তবে এটা ঠিক, সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও সামাজিক-ডাকাত কখনও বিপ্লবী নয়। তারা সামাজিক অস্থিরতার লক্ষণ হয়তো, হয়তো তাদের মুখের হারে-রে-রে সামাজিক প্রতিবাদেরই ভাষা, কিন্তু তবু তাদের সমাজ পরিবর্তনের অগ্রপথিক বলে মানতে রাজী হবেন না কেউ। তেমন হাতে পড়লে আদর্শবাদের পাথরে ঘষে ঘষে কেউ তাদের ধারালো হাতিয়ারে পরিণত করতে

পারেন এই যা। অন্যথায় সামাজিক-ডাকু এক ধরনের কূপমণ্ডূক, তার দৃষ্টি খুবই সংকীর্ণ। সাধারণত তার মনোবাসনা—ঐতিহ্যগত বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী করে রাখা। তা হাতছাড়া হয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। সমাজকে যারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় ওরা তার বিরুদ্ধে। কখনও কখনও তারা প্রগতির পথেও প্রতিবন্ধক। সেদিক থেকে ডাকাতি কোনও সামাজিক আন্দোলন নয়, প্রতিরোধের প্রতীক মাত্র। ইতিহাসের অতি দুঃসাহসী সামাজিক ডাকুও বোধ হয় জানে না, কৃষকের মুক্তির পথ কোন্‌দিকে বা কোথায়। দেশে কিছু মানুষ থাকবে, অনেক মানুষ গরিব, সেটা তার কাছে আপত্তিকর নকশা নয়। সামন্তপ্রভু ভূমিদাসের মেয়ের দিকে নজর দেবেন, আপত্তিকর নয় সেটাও। প্রতিবাদ বাড়াবাড়ি ঘটলেই, অবিচার করলে। আধুনিক কালে যাকে বলা হয় ভূমি সংস্কার, বলা নিষ্প্রয়োজন, নিজেরা কৃষক হওয়া সত্ত্বেও সেদিনের সামাজিক ডাকু সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সত্য, সামাজিক ডাকুও স্বপ্ন দেখে। অত্যাচারমুক্ত, ন্যায়সম্মত শান্তিপূর্ণ সমাজের। যে-সমাজে চাষী সুখে শান্তিতে বাস করবে, অত্যাচারীর বদলে জমিদার বা রাজা হবেন প্রজারঞ্জক। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ফলে, দেখা গেছে অনেক ডাকুও শেষ পর্যন্ত নিজেই রাজা হতে চায়। কিংবা মানুষ। কাছাকাছি জাহাজগুলোর ডেকেও অনেক দর্শক। ন'টার কিছু আগে চম্বলে ছিল বিখ্যাত এক দস্যু দলপতি। নাম তার গজরাজ। রাস্তায় রাস্তায় বাঁদর নাচ দেখিয়ে ফিরত সে। ক্রমে বাধক দস্যুদের নায়ক। চম্বলের রবিনহুড্ বলে খ্যাতি ছিল তার। সেটা গত শতকের তৃতীয় দশকের কথা। গোয়ালিয়র দরবার তাকে শান্ত করেছিলেন রাজ্যের সব খেয়াঘাটগুলোর দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে। আলোয়ারে যে-মীনা-দস্যুদল আতঙ্ক, জয়পুরে দেখা যেত তারা রাজার ধন দৌলত পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে। তাই বলছিলাম এমন কি সামাজিক-ডাকুর দৃষ্টিভঙ্গীও খুবই সংকীর্ণ। সে বিদ্রোহী ঠিক-ই কিন্তু তার মনে কোনও মহৎ আদর্শের পীড়ন নেই, নেই বৃহৎ কোনও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওযার তাড়না।

অতএব মহীশূরের ধুনাধিযার (১৭৯৯-১৮০০) দুঃসাহসিকতা আমাদের আকর্ষণ করলেও, আমরা তার শৌর্যবীর্য দেখে চমৎকৃত হলেও তাকে বিপ্লবী আখ্যা দিতে পারি না। ধুনাধিয়া ছিল নাকি মহীশূরের এক দুর্ধর্ষ দস্যু দলপতি। টিপুর এলাকায় দৌরাত্ম্য করে ফিরত সে। টিপু তাকে পাকড়াও করে ইসলামে দীক্ষিত করেন, তারপর টেনে নেন নিজের সামরিক বাহিনীতে। শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধের পর দেখা গেল ধুনাধিয়া টিপুর কারাগারে বন্দী। ইংরাজরা তাকে মুক্তি দেয়। তার পরক্ষণেই সে এক অসমসাহসী বিদ্রোহী। তার বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হল—সে বুঝি আর নিছক দস্যু দলপতি নয়। ধুনাধিয়া এক উদীয়মান রাজনৈতিক পুরুষ যেন। শেষ পর্যন্ত কর্নেল ওয়েলেসলিকে অস্ত্র ধারণ করতে

হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। ঐতিহাসিকরা বলেছেন ধুন্দিয়া বেঁচে থাকলে আর এক হায়দর আলি হত। কিন্তু দরিদ্রের মুক্তিদাতা হতো কি?

সে-পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়নি উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের গুজর দল-পতি কল্যাণ সিংও। ১৮১৩ সনে ওদের নিজস্ব এলাকা তছনছ হয়ে যায়। স্বাধীনতা ওদের রক্তে। ওরা পথে নামে। গঙ্গার এপারে ওপারে লুট করে। দরকার হলে খুনও। কালুয়া ওদের দলপতি। কালুয়ার দল এমন কি হামলা করে দেরাদুনেও। ধন দৌলতের চেয়ে ওদের আকর্ষণ যেন স্বাধীন জীবনের দিকেই—লিখছেন ইংরাজ গেজেটিয়ার লেখক। ওরা কারও খবরদারি নজরদারি পছন্দ করে না। অবশেষে কালুয়া একজন তালুকদারের সঙ্গে হাত মেলাল। তারপর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হামলা চালাল থানার ওপর। হাজার সশস্ত্র লোক তার দলে। নাম নিল সে রাজা কল্যাণ সিং। বিদেশী শাসন উৎখাত করবে এই তার সংকল্প। আর এক সংকল্প নিজের দলের সুখ বিধান। বলাই বাহুল্য, কল্যাণ সিংয়ের কোনও স্বপ্নই পূর্ণ হয়নি। ইংরাজেরা দু'শ গোর্খার এক বাহিনী পাঠায় তার বিরুদ্ধে। কল্যাণ সিং অতঃপর একজন বিদ্রোহীর নাম মাত্র। সাহারানপুরের দরিদ্র জনতা জানে একদা তাদেরই একজন বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিল।

কে তাদের কী দিতে পেরেছিল, আপন এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের কাছে সেটা আদৌ গুরুতর প্রশ্ন নয়, তার চেয়েও জরুরী খবর—ডাকু তাদের অবিচার অত্যাচার শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। এমন কি এজন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত পণ করতে পিছু-পা নয় সে। অনেক ডাকু সে-সাহসিকতাও দেখিয়েছে। শুধু নাটকে বা গল্পে উপন্যাসে নয়, বাস্তবেও। এই শতকের প্রথম দিকে দাগে-স্তানের রবিনহুড্ ছিল জেলিম খান। জার-এর সেনাপতিকে সে বলেছিল—যাও, সম্রাটের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এসো। তাতে যেন লেখা থাকে আমি সব বন্দীকে ছেড়ে দেব, নিরপরাধ দরিদ্র প্রজাকে আর শোষণ করব না। বাড়তি ট্যাক্স সব মকুব করে দেব। যাও, আজ মাঝরাত্তির পর্যন্ত সময় দেওয়া গেল তোমাকে। অনেক সামাজিক-ডাকু সম্পর্কেই প্রচলিত আছে এমনি সব কাহিনী। আর সে-কারণেই বুঝি তারা মরে গেলেও মরে না। কালান্তরেও বেঁচে থাকে রবিনহুড্‌রা, জনতা শতশত বছর ধরে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে তাদের স্মৃতি। কেননা, তার মৃত্যু মানে স্বপ্নের বিলুপ্তি, নিজেদের আশার মৃত্যু। অবিচার অত্যাচারের মধ্যেও বেঁচে থাকতে পারে মানুষ, কিন্তু স্বপ্ন ছাড়া বাঁচতে পারে না। সে-কারণেই হয়তো চরম সংকটের মুহূর্তেও বিদ্রোহী সাঁওতালদের মুখে শোনা গিয়েছিল অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসের কথা—সাহেবের বন্দুক বুলেটের সাধ্য নেই আমাদের ঘায়েল করে। সে-কারণেই এই সেদিন চম্বলে শোনা গেছে মূঢ় উক্তি—"মান সিংকো মারনেওয়ালী গোলী অব তক নহী বনী।" মান সিংয়ের মধ্যে ওরা যদি রবিন-হুড্ কিংবা ভবানী পাঠকের ছায়া দেখে থাকে তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা, এই বিশ শতকের শেষ প্রহরেও চম্বলে যেন এখনও দ্বাদশ শতকের শের উড

অরণ্যের অন্ধকার। কিম্বা চম্বল উপত্যকা যেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিককার বাংলা। সুতরাং, রাশি রাশি খুনের পরও তার নামে ছেলেভুলানো ছড়া—"আজারে নিন্দিয়া আজা/দুয়ারে খাড়া মান সিং রাজা।"

ফাঁসিবাজার
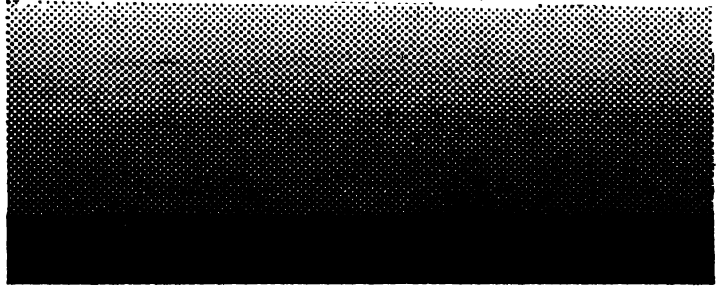
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে যত্ন করে জমিয়ে রাখা রাশি রাশি দলিলের ভিড়ে লুকিয়ে আছে একটি টুকরো কাগজ। কাগজটি কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগের বিনত স্বীকৃতি। তারিখ—১৪ জুলাই ১৮১৪। তাতে কেউ একজন জানাচ্ছেন, পুরানো মাটির ঘাটে গঙ্গার বুকে নৌকোর ওপর কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ফাঁসির পর যথাবিহিত মৃতদেহ টাঙিয়ে রেখে আসা হয়েছে ডাঙায়। আর, এই বাবদে হরেক খরচ একুনে আটাশ টাকা এগারো আনা তিন পাই।

কার ফাঁসি হয়েছিল সেদিন, কেনই বা আমরা জানি না। কিন্তু যখনই টানা হাতে লেখা ওই বিবর্ণ কাগজের ফালিটির কথা মনে পড়ে তখনই মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। একই বিষাদ টুকরো মেঘের মতো উঁকি দেয় মনে হঠাৎ যখন জানবাজারের মোড়ে মিনিবাসটি থমকে দাঁড়ায়। হুড়মুড় করে যে-সব যাত্রী নেমে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কি জানেন তারিখটি ১৮০৭ সনের ২৬ জুন হলে তাঁদের সাধ্য ছিল না নেমেই এভাবে যে যাঁর কাজে ছুটে যান। 'ক্যালকাটা গেজেট' লিখছে (২ জুলাই, ১৮০৭): গত শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটায় গোরাচাঁদ চণ্ডালের ফাঁসি হয়ে গেল জানবাজারে, সেই বাড়িটির সামনে যেখানে সে চুরি করেছিল। ফাঁসি দেখতে অনেক লোক জমায়েত হয় সেখানে।

শুধু কি জানবাজারে? কোথায় নয়? ফ্যানসি লেনের কথা সবাই জানেন। ফ্যানসির শব্দগত ব্যুৎপত্তি খুঁজতে গেলে নাকি ফাঁসি-ই মেলে। ফাঁসি থেকেই

ফ্যানসি। ইতিহাস-পাঠকের কিন্তু এক এক সময় মনে হতে পারে গোটা কলকাতাই বুঝিবা এক ফ্যান্সি ল্যান্ড। অষ্টাদশ আর উনিশ শতকের প্রথম দিকে শহরের যে দিকেই তাকাই কেবল ফাঁসি আর ফাঁসি। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ঐতিহাসিক ঘটনা। ফাঁসির তারিখ—আগস্ট ১৭৭৫। ফাঁসি হয়েছিল হেস্টিংস-এর কুলিবাজারে। আজকের খিদিরপুর ব্রিজের উত্তর দিকে। বলা বাহুল্য, কলকাতায় সেই প্রথম ব্রহ্মহত্যা হয়তো, কিন্তু বোধ হয় প্রথম ফাঁসি নয়। আগে, ১৭৭০ পর্যন্ত কলকাতায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের হত্যা করা হত চাবুক মেরে। ১৭৬০ সনে স্থির হয় তার চেয়ে ভাল তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া। তারপর, হয়তো বারুদ বাঁচাতে, এলো ফাঁসিমঞ্চ। মহারাজার আগে পরে আরও অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসিকাঠে অর্থাৎ সরকারী জল্লাদের হাতে। ৩০ জুলাই, ১৭৯৫ঃ ক্যালকাটা গেজেট-এ খবরঃ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম ক্রিমিন্যাল সেসন বসেছিল। তাতে ছয়জন চোরের সাজা হয়। একজন বাঙ্গালী, বাকি সব ইউরোপীয়। তাদের একজনের ফাঁসি হয়ে গেল চৈতন শীলের বাড়ির সামনে। গলির দু'পাশে ছাদে বারান্দায় জানালায় না জানি সেদিন কত ভিড়। শেরিফের খাতা বলছে ১৮২৫ সন পর্যন্ত প্রধান বধ্যভূমি ছিল কুলিবাজার। তবে মাঝে মধ্যে ফাঁসিমঞ্চ স্থাপিত হত এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় গৃহস্থ বাড়ির সামনে সদর রাস্তায়। ক্রমে আর একটি বধ্যভূমি হয়ে দাঁড়াল লালবাজার। সেখানে জেলখানার অদূরে রাস্তার মোড়ে ব্ল্যাকটাউনের মানুষ মাঝে মাঝে দল বেঁধে আসত ফাঁসি দেখতে। ১৩ জুন ১৮০৭ ; জানবাজারের ঘটনার মাত্র ক'দিন আগের কথা। ক্যালকাটা গেজেট-এ আবার তাজা খবরঃ ম্যানিলা থেকে একটি লোক এসেছিল কলকাতায়। এখানে একটি ভারতীয় মেয়েমানুষকে ছুরি মারার অপরাধে তার ফাঁসি হয়ে গেল লালবাজারে চৌরাস্তার ওপরে। কে এই আগন্তুক ? কেন সে হঠাৎ ছুরি মারতে গেল বিদেশী বান্ধবীকে ? লোকটির বাড়িতে কেউ ছিল কি ? তারা কি খবর পেয়েছিল লালবাজারে কী ঘটে গেল ! এক একটি খবর এমনি হাজার প্রশ্ন তোলে। তারপর যা হয়, আবার পাতা উলটে যান পাঠক।

যেসব অপরাধ সংঘটিত হত নদীতে, তার জন্য অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত নদীতেই। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। ১৩ ডিসেম্বর ১৮১৩ শহরে রটে গেল চারজন পর্তুগীজ দস্যুর ফাঁসি হবে নদীতে। অপরাধ—তারা 'এশিয়া' নামে একটি ইংরাজ তরীর ক্যাপটেনকে হত্যা করেছে। 'এশিয়া'র ক্যাপ্টেনের নাম —স্টুয়ার্ট। ইংরাজ কর্তারা কলকাতার ঘাটে নোঙ্গর-করা সব জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নির্দেশ দিলেন ফাঁসির অনুষ্ঠানে প্রত্যেকে যেন একখানা করে নৌকো পাঠান। কেননা, তাতে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি হবে। লণ্ডনের 'টাইমস' কাগজের একজন প্রতিনিধি সেদিন উপস্থিত ছিলেন কলকাতায়। তিনি লিখছেনঃ সকালে ফাঁসির কথা সকলকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় তোপধ্বনি দিয়ে। শুরু হল প্রস্তুতি। যে-বজরার পাটাতনে ফাঁসি হবে সেখানে হলুদ পতাকা উড়ছে। চারদিকে নৌকোর

ভিড়। ভিড় ডাঙ্গায়ও। নদীর ধারে তো বটেই, দুধারে বাড়ির ছাদেও রাশি রাশি মানুষ। কাছাকাছি জাহাজগুলোর ডেকেও অনেক দর্শক। ন'টার কিছু আগে অপরাধীদের কয়েদী-গাড়ি করে নিয়ে আসা হল ওল্ড ফোর্ট ঘাটে। সেখান থেকে নৌকোয় করে ভাসমান ফাঁসিমঞ্চের সামনে। বেলা ন'টা কুড়ি মিনিট। আবার তোপধ্বনি। সব শেষ।

আসলে কিন্তু সব তখনও শেষ হয়নি। তারপরও ছিল কিছু অনুষ্ঠান। ১৮২০ সন পর্যন্ত কলকাতায় নিয়ম ছিল মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হবে নদীর ধারে। দর্শকরা যাতে দেখে বুঝতে পারে ইংরাজের শহরে অপরাধীর ঠাঁই নেই। ১৮২০'র পরে ফাঁসির আসামীর দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হত নদীর জলে। সে-প্রথার চল ছিল নাকি ১৮৫৫ পর্যন্ত। তার আগেকার দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনও শিউরে উঠতে হয়। নদীপথে শহরের দিকে এগিয়ে আসছেন দেশী বিদেশী আগন্তুকরা। অদূরে বন্দর কলকাতা। তার আগে হঠাৎ চোখের সামনে এ কী দৃশ্য! আজ যেখানে শিবপুরের বাগান তার উলটো দিকে নদীর বাঁকে ডাঙায় ঝুলছে সার সার মৃতদেহ। চারদিকে শেয়াল শকুনের ভিড়। ইংরাজ নাবিকরা নদীর এই বাঁকটির নাম দিয়েছিলেন নাকি 'মেলানকালি পয়েন্ট'—বিষাদ-বিন্দু!

যদি নামকরণের এই ব্যাখ্যা সত্য হয় তবে মানতেই হবে লজ্জাকর স্মৃতিকে গোপন করাই কলকাতার চরিত্র নয়। ফ্যানসি লেনের আড়ালে যদি এই শহর কিছু হতভাগ্যের শব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে তবে মেলানকলি পয়েন্ট এখনও হাঁক দিয়ে চলেছে—ফাঁসি আর ফাঁসির খবর। সদ্যবিগত বর্বর-যুগের বীভৎস এক আচারের কথা।

শুধু কি কলকাতায়? কলকাতায় যদি এখনও থেকে থাকে ফ্যানসি লেন, গৌহাটিতে তবে রয়েছে ফ্যান্‌সি বাজার। সেও ফাঁসি থেকেই। দমদমের পথের ধারে যদি বিশেষ একটি আমগাছের স্মৃতি, কানপুরের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল নাকি 'লাল ইম্‌লি'। শোনা যায়, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরে কিছু বিদ্রোহীকে ঝোলানো হয়েছিল, দমদমের পথের ধারে আমগাছের নির্ভরযোগ্য ডালে। আর কানপুরের সে-দায়িত্ব পালন করেছিল একটি প্রবীণ তেঁতুল গাছ। কত মানুষ যে সেদিন ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছেন এদেশে তার হিসেব নেই। শুধু কলকাতা কেন, শুধু ভারতই বা কেন, পিছু ফিরে চারপাশে তাকালে দেখা যাবে জল্লাদ সেদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে ভুবনময়। ঘাতকদের কারও হাতে দড়ি, কারও হাতে হয়তো বা অন্য কিছু।

ষোড়শ শতকের ইউরোপে জল্লাদরা রীতিমত ঘর্মাক্ত কলেবর। আমাদের ভূতপূর্ব প্রভুদের স্বদেশ ইংল্যাণ্ডের কথাই ধরা যাক। এক অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে বছরে বাহাত্তর হাজার মানুষকে নাকি ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়েছে

সেখানে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেও সেখানে জমজমাট মৃত্যুর উৎসব। কথায় কথায় ফাঁসি। ইংলণ্ডে তখন ফাঁসি হয় ২২০ থেকে ২৩০টি অপরাধের জন্য। বিচক্ষণ আইনজীবী কিংবা বিচারক ইচ্ছে করলে অল্পায়াসে সে-তালিকা আরও দীর্ঘ করতে পারেন, শুধু ব্যাখ্যার হেরফের করতে পারলেই হল। মৃত্যুদণ্ড-যোগ্য অপরাধের তালিকায় তখন ছিলঃ চুরি, রাহাজানি, পকেটমারি, ভবঘুরে বেশে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো, জিপসিদের সঙ্গে মেলামেশা, বিনা ছাড়পত্রে ডক এলাকায় ঘোরাফেরা, কারও পুকুরের জল নষ্ট করা, কারও বাড়িতে আগুন দেওয়া, ভয় দেখিয়ে কাউকে চিঠি দেওয়া, নাম ভাঁড়িয়ে কারও পেনসন আত্মসাৎ করা, গাছ কাটা, লর্ডদের বনে বিনা অনুমতিতে শিকার করা, জাল করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাসের কোনও অন্ধকার যুগের কাহিনী নয়। এই কানুন কার্যত চালু ছিল দিগ্বিজয়ী মহারানী ভিকটোরিয়ার আমলেও। অর্থাৎ, উনিশ শতকেও। বিশেষ করে গরীব দুঃখীর তখন প্রাণ বাঁচানো দায়। তার জীবিকা কী, ঠিক মতো বোঝাতে না পারলেই হয়তো আইনের কোনও না কোনও ধারায় ফাঁসির দড়িতে আটকা পড়ে যাবে গলা। স্থায়ী ঠিকানা না-থাকাটাও রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। তাছাড়া, চুরি-ডাকাতিতেও ঝুঁকি খুবই বেশি। আগেই বলেছি, কথায় কথায় সেদিন ফাঁসি। পুরুষ, নারী, শিশু, কারও রেহাই নেই।

১৮০১ সনে ইংলণ্ডে অ্যানড্রু ব্রেনিং নামে তেরো বছরের একটি ছেলের ফাঁসি হয়। অপরাধ—সে একটি বাড়িতে ঢুকে একটি চামচ চুরি করেছিল। ১৮৩১ সনে চেমস্‌ফোর্ডে একটি ন' বছরের ছেলের ফাঁসি হয়। সে নাকি প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ১৮৩৩ সনে আরও একটি বালককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন বিজ্ঞ বিচারকরা। অভিযোগ—সে একটি দোকানের ভাঙ্গা জানালা দিয়ে কাঠি ঢুকিয়ে কিছু ছবি আঁকবার রং চুরি করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাজার হাজার মানুষের আবেদনে তাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু তথাকথিত অপরাধীদের অধিকাংশকেই গুনে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। কেননা, ক্ষমতা সেদিন যাঁদের হাতে, তাঁরা নিজেদের বিষয়-আশয় রক্ষায় বড়োই মনোযোগী। মানুষের প্রাণের চেয়েও তাঁদের চোখে মূল্যবান নিজের বাগানের একটি গাছ, কিংবা খাবার-টেবিলের একখানা চামচ।

সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকের কলকাতায়ও ন্যায়-ধর্মেরই ঘন ছায়াপাত। এখানে মানুষ খুন করলে একটাকা দণ্ড তার, কিন্তু চুরি করলে ফাঁসি কিংবা দ্বীপান্তর নির্ঘাৎ। নিদেনপক্ষে সাজা—হাত পুড়িয়ে দেওয়া!

১৮০৪ঃ জন ম্যাকল্যাকলিন নামে এক সাহেব নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং দণ্ড ধার্য হল এক সিক্কা টাকা জরিমানা এবং এক মাস জেল।

১৮০৬ঃ মথুরায় অ্যালেকজাণ্ডার মুর নামে এক সাহেব ওয়েন ম্যাকইং নামে এক সাহেবকে হত্যা করে দণ্ড লাভ করলেন কুড়ি টাকা জরিমানা এবং এক বছর কারাবাস। এলাহাবাদে এক সাহেব আর এক সাহেবকে হত্যা করে জেল খাটলেন এক সপ্তাহ, তৎসহ নগদ জরিমানা—এক টাকা।

১৮১২ঃ সোদ নামে এদেশীয় এক খুনীর জরিমানা ধার্য হল একটাকা, কারাবাস এক বছর। একই বছরে কলকাতায় খুনের দায়ে পড়ল বৃন্দাবন ধোপা। বিচারে দণ্ড স্থির হলঃ হাত পুড়িয়ে দিয়ে এক বছর জেলে ফেলে রাখা। অন্যদিকে সে বছরই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হল বিজয় মশালচীকে। কেননা, অপরাধ তার ডাকাতি। ইমাম বক্স চলল দ্বীপান্তরে। সেও ডাকাত। ১৮০০ সনে ব্রজমোহন নামে এক হতভাগ্যের ফাঁসি হয়েছিল এই কলকাতায়। তার অপরাধ সে একটি ঘড়ি চুরি করেছিল। ঘড়ির দাম—পঁচিশ টাকা। হরি পাল, প্রসাদ পাল, চৈতনেরও ফাঁসি হয়। তাদের অপরাধ—রাহাজানি। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে কে বা কারা বাঙালীটোলায় রটিয়ে দিয়ে গেল সে-খবর। পিল পিল করে লোক চলেছে জানবাজার কি লালবাজারের দিকে ফাঁসি দেখতে।

এই আচারও পশ্চিমের হুবহু নকল। অষ্টাদশ শতকে লণ্ডনের টাইবার্ন নামক বিন্দু এক একদিন জনসিন্ধু হয়ে যেত। সেখানে ফাঁসি হচ্ছে বলতে গেলে দ্বাদশ শতক থেকে। ফাঁসি মানে তৎকালে 'মৃত্যু অবধি' দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা মাত্র নয়, তার আগে পরে নানা ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা। মুণ্ড-ছেদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন—আরও কত কী অনাচার ব্যাভিচার। পথের ধারে কাটা মুণ্ডু সাজিয়ে রাখা হত দিনের পর দিন। কৌতূহলী পথিকেরা ছ'পেনি দিয়ে টিকিট কেটে চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে সেগুলো পরখ করে দেখতেন। বিশ্বাস হয় না অষ্টাদশ শতকের পৃথিবীতেও মানুষের পক্ষে এমন বর্বরতার চল ছিল। কিন্তু ইতিহাস পাঠক জানেন ঘটনা সত্য। সৌখিন নারী-পুরুষ তখন পয়সা দিয়ে পাগলা গারদে বেড়াতে যেতেন আমোদ লুটবার জন্য। শুধু ইংলণ্ডে নয়, এ-তমসা সেদিন বিস্তৃত তামাম ইউরোপে।

যাক, টাইবার্ন-এর কথায়ই ফিরি।

১৭৬০ঃ ছয় ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে লর্ড ফেরারস চলেছেন টাইবার্নের দিকে। ফাঁসি দেখতে নয়, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে। তিনি তাঁর নিজের একজন কর্মচারীকে খুন করেছেন। সে-অপরাধে ফাঁসির হুকুম হয়েছে তাঁর। স্বভাবতই টাইবার্নে সেদিন আরও ভিড়। শেরিফ ভিড় সামলাতে হিমসিম। লর্ড নিজেই বললেন—ভিড় একটু হবেই তো, ওরা তো আগে আর কখনও কোনও লর্ডের ফাঁসি দেখেনি!

টাইবার্নের ফাঁসি উপলক্ষে নাকি রীতিমত উৎসবের আবহাওয়া। ছোট্ট জায়গা, অনেক মানুষ। তাদের মধ্যে আবার অপরাধী আর হবু-অপরাধী মেলাই। ফলে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি, ছিনতাই, পকেটমারি—লেগেই থাকত।

ওল্ডবেইলি থেকে টাইবার্ন পর্যন্ত পথের ধারে যাঁদের বাড়ি তাঁরা জানালা বারান্দা কিংবা ছাদভাড়া দিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করতেন। যাঁরা তা পারতেন না তাঁরা চেঁচামেচি করতেন—এসব কী হচ্ছে? আমরা কি নিজেদের বাড়িতে শান্তিতে ঘুমোতেও পারব না? শেষ পর্যন্ত স্থির হয় টাইবার্নের বদলে ফাঁসিমঞ্চ স্থানান্তরিত হবে নিউগেটে। জেলখানা থেকে জায়গাটা দূরে নয়। তাছাড়া একটু খোলামেলাও বটে! সুতরাং ফাঁসির ব্যবস্থা করা হয় সেখানে। কিন্তু সেখানেই কি শান্তি আছে? নিউগেটেও একই ভিড়। ভিড়ের আর এক কারণ ফাঁসির যন্ত্র এবং মঞ্চ দুইয়েরই কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। যাকে বলে—সংস্কার। আগে আগে ফাঁসি দিতে গিয়ে জল্লাদরা প্রায়ই বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসত। কখনও যান্ত্রিক গোলযোগ, কখনও বা অন্যকিছু। দর্শকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। অনেক সময় জল্লাদের ওপর হামলাও হত। দর্শক আনাড়ির হাতের খেলা দেখতে চায় না, চায় নিখুঁত হত্যাকাণ্ড দেখতে। এমন হত্যাকাণ্ড যা শিল্প-সুষমামণ্ডিত (জল্লাদের কাজকে একজন ভূতপূর্ব জল্লাদ বলেছেন—'আর্ট', সুকুমার শিল্প)! সুতরাং, ১৭৮৩ সনে চালু হয় উন্নতমানের ফাঁসি-যন্ত্র। তা-ই দিয়ে শুরু হয় নিউগেটে মৃত্যুর নতুন পবব। অনুষ্ঠানেব অন্য আয়োজনেও রীতিমত নতুনত্ব। গোটা ফাঁসিমঞ্চটি কালো কাপড়ে মোড়া। মঞ্চে শুধু জল্লাদ আর তার সহকারী এবং সহযোগীরাই নয়, অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য রক্ষার জন্য হাজির একজন পাদ্রীও। তাছাড়া, কয়েদীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে ফাঁসি মঞ্চ থেকে নামানো পর্যন্ত অবিরল অনর্গল বেজে চলে ঘণ্টা। জনতা কিন্তু তবু অশান্ত।

১৮০৭ঃ নিউগেটে সেদিন হলোওয়ে আর হেগার্টি নামে দুজন অপরাধীর ফাঁসি হয়। তাদের দেখবার জন্য নাকি চল্লিশ হাজার মেয়েপুরুষ ভিড় করেছিল ফাঁসিমঞ্চের চারদিকে। শেরিফের অফিস থেকে মাঝে মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল হুঁসিয়ারিঃ বিওয়্যার অব এনটারিং কি ক্রাউড! কিন্তু কে কাব কথা শোনে! ভিড় ঠেলে বাচ্চা কোলে মায়েরা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে চান সামনের দিকে। তুমুল কোলাহল। এবং শেষপর্যন্ত মারাত্মক পরিণতি। অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়েছে তখন সিটি মার্শালরা দেখলেন ফাঁসি মঞ্চের চারদিকে ছড়িয়ে আছে কমপক্ষে একশ শব! কিছুক্ষণ আগেও এরা ছিল দর্শক।

১৮৪০ঃ সেবার নিউগেটে ফাঁসি হয় এক দম্পতির। জর্জ মেনিং এবং তাঁর স্ত্রীর। অপরাধ খুন। ফাঁসি দেখতে হাজির ছিলেন চার্লস ডিকেন্স। জনতার কাণ্ড দেখে তিনি স্তম্ভিত। এমন অসভ্যতা, এমন উন্মত্ত আচরণ নাকি আর কখনও দেখেননি তিনি। টাইমস-এর প্রতিনিধির কাছে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—ঘৃণায় গা ঘিন ঘিন করছিল আমার। পরে এক বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখে-ছিলেন—মনে হচ্ছিল যেন আমি শয়তানদের কোনও শহরে বাস করছি!

শুধু ব্রিটেন কেন, ইউরোপের অন্যত্রও ফাঁসির মঞ্চ ঘিরে জনতার এমনি

উন্দাম নৃত্য। উল্লাস কখনও হয়ত বা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে, কখনও গিলোটিনের সামনে, কখনও বা অন্য কোনও মারণ-চক্রের চতুর্দিকে—এই যা। নিখরচায় এমন আমোদ কী হতে পারে! রোমানদের ছিল অ্যাম্ফিথিয়েটার, অষ্টাদশ উনিশ শতকের ইউরোপের আছে ফাঁসির মঞ্চ, আর হাড়ি কাঠ। উচ্চ-নীচ, ধনী-গরিব, শিশু-নারী—সকলের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষেই যেন সমান উৎসাহ। উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় দর্শকদের মনে। লেডি জেনি গ্রে, কিংবা স্কটদের রানীর হত্যাকাণ্ড না-হয় ষোড়শ শতকের ঘটনা, এমনকি অষ্টাদশ উনিশ শতকেও কিন্তু অনেক ইংরাজ নারী জীবন দিয়েছেন ফাঁসি কাঠে। তাদের বলা হত—'ফেয়ার ক্রিমিন্যাল!' জোন অব আর্ক পঞ্চদশ শতকের উপাখ্যান। কিন্তু সকলেই জানেন, রানী মারি অ.তোনেৎ কিংবা মাদাম দ্য ব্যারি ফরাসী বিপ্লবের শিকার। দ্য ব্যারি নাকি উৎফুল্ল জনতার দিকে চেঁচিয়ে বলেছিলেন—সিটিজেনস, আমি সামান্য রমণী। আমি তোমাদেরই একজন দোহাই লাগে আমাকে ছেড়ে দাও! কিন্তু কে কার কথা শোনে!

বধ্যভূমিতে ভিড় হত অন্য কারণেও। ইউরোপে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মৃতদেহ ঘিরে সেদিন নানা কুসংস্কার। অনেক মানুষেরই বিশ্বাস ছিল ফাঁসির আসামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লুকিয়ে আছে জাদুকরী শক্তি। শবের শীতল হাতের স্পর্শে বাত সেরে যায়, মৃগীরোগের উপশম হয়। বিশেষত, আসামীর মৃত্যু-ঘামে ভেজা হাতের স্পর্শে চর্মরোগের সম্ভাবনা নাকি চিরতরে ঘুচে যায়। ফাঁসির পর অপরাধীর দেহ যে কাষ্ঠখণ্ডটিতে ঝুলিয়ে রাখা হত সেটির টুকরো নাকি আবার দাঁতের ব্যথার মহৌষধি। প্রুশিয়ায় গেরস্থ বৌ বধ্যভূমিতে যেত কাপ, চামচ, কিংবা ন্যাকড়া নিয়ে। তারা মৃতের রক্ত সংগ্রহ করতে চেষ্টা করত। তারও নাকি বিশেষ দ্রব্যগুণ। ইংলণ্ডে দোকানীরা চেষ্টা করতেন অপরাধীর আঙুল সংগ্রহ করতে। শুকিয়ে ক্যাশবাক্সে রেখে দিতে পারলে সে-বাক্সে নাকি লক্ষ্মী অচলা হয়ে থাকেন। টাইবার্নে ইঞ্চি ইঞ্চি করে কেটে জল্লাদরা ফাঁসির দড়ি বিক্রি করত। সে-দড়িরও নাকি নানা মাহাত্ম্য। টাইবার্নের ঘটনা। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন—একদিন দেখা গেল একটি তরুণীকে তার মা জোর করে টেনে নিয়ে হাজির হয়েছেন মঞ্চে। তারপর ঠেলে দিলেন একেবারে জল্লাদের কোলে। হাজার হাজার লোকের সামনে জল্লাদ এক হ্যাঁচকা টানে মেয়েটির বুকের কাপড় সরিয়ে দিয়ে তার উন্মুক্ত স্তনে স্থাপন করল মৃতের হিমশীতল হাত। মেয়েটি থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু মা এবং জল্লাদ দুজনেই নাছোড়বান্দা। সে এক বীভৎস, লজ্জাকর দৃশ্য!

এইসব কুসংস্কারের জন্য মাঝে মাঝে দেখা যেত ফাঁসি হতে-না-হতে অর্থাৎ যমে মানুষে টানাটানির পালা শেষ হতে-না-হতে শুরু হয়ে গেছে সরকারী সার্জনদের লোক আর জনতার মধ্যে শব নিয়ে কাড়াকাড়ি। শেরিফের লোকদের সাধ্য কী, সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামায়!

তুলনায় আমাদের দেশের পরিবেশ যেন অনেক শান্ত, সংযত এবং গম্ভীর। প্রসঙ্গত অনিবার্যভাবেই মনে পড়ছে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির কথা। বিচারের প্রহসন শেষ হওয়ার পর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে নন্দকুমার বেঁচে ছিলেন বারো-দিন। ফাঁসি হয় তাঁর ৫ আগস্ট, ১৭৭৫। ঘটনার তিন ঘণ্টা পরে শেরিফের সেক্রেটারি ম্যাক্রেবি খসখস করে লিখে গেলেন তার বিবরণ:

"আমরা বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ময়দান লোকে পরিপূর্ণ হইযা গিয়াছে, ইহাদিগের ভিতর কাহারও হাঙ্গামা করিবার ভাব দেখিলাম না। মহারাজা পাল্কীতে বসিয়াই একবার চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। ফাঁসি-কাঠ দেখিয়া মহারাজের মুখে কোনও উদ্বেগের ভাব দেখিতে পাইলাম না।... সময় উপস্থিত দেখিয়া আমি বধ্যমঞ্চের নিকট পাল্কী আনিতে বলিলাম। তিনি পাল্কী হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে মঞ্চ-সোপানের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বন্ধ করা হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একবার চতুর্দিক দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই! তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চোপরি উপস্থিত হইলেন। মহারাজার মুখ আচ্ছাদিত হইল। তিনি সরলভাবে দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি নির্ভয়চিত্তে স্থিরতর নিস্পন্দ-ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে না-পারিয়া নিজের পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ইহার পরই মঞ্চাপসারণের শব্দ শুনিতে পাইলাম. .।" (সত্যচরণ শাস্ত্রীর অনুবাদ)।

লক্ষণীয়, কলকাতার সঙ্গে টাইবার্ন কিংবা নিউগেটের দৃশ্যাবলীর কত গরমিল। আমরা আজকের পাঠকের রুচির কথা ভেবে সেখানকার বীভৎসতার অনেক বিবরণ এড়িয়ে গেছি। খৃস্টোফার হিবার্ট-এর "রুটস অব ইভিল", কিংবা 'রোড টু টাইবার্ন' পড়লে মনে হবে কলকাতা বুঝি-বা স্বর্গোদ্যান। একটা কারণ হয়তো এই, এদেশের গরিব নিত্য যেখানে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে কিংবা সাধারণ খাদ্যাভাবে বা ব্যাধিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মরে অভ্যস্ত সেখানে কর্মফলে বিশ্বাসী হতভাগ্যের দল বোধহয় ঈশ্বরের ওপর মানুষের এই সব বিচারে খুব আস্থাবান ছিল না। তাছাড়া, ব্রিটেনে খেলা চলে দেশের মানুষকে নিয়েই, শতকের পর শতক দেখে দেখে সেখানকার মানুষ হয়তো এই নিষ্ঠুরতাকে এক ধরনের জাতীয় ক্রীড়া বলেই গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে কলকাতা বা ভারতে নিশ্চয়ই রচিত হয়েছিল রাজা আর প্রজার ব্যবধান। যারা ফাঁসি দিচ্ছেন তাঁরা বিদেশী, যাঁরা ফাঁসিতে ঝুলছেন অধিকাংশই তাঁরা স্বদেশের মানুষ—উৎসবের বাতাবরণ সৃষ্টির পক্ষে এই অনুভূতি বোধহয় খুব অনুকূল নয়। লক্ষ্য করার বিষয় ঘাতকদের আচরণও এখানে অন্যরকম। ম্যাক্রেবি শেষমুহূর্তে পালিয়ে এসেছিলেন নিজের পালকিতে। আর জনতা? সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায়—সমবেত জনতার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল গভীর আর্তনাদ। মহারাজা নন্দকুমারকে তাঁর সমগোত্রীয় মান্য এবং সম্পন্ন ব্যক্তিরা বাঁচাবার কোনও চেষ্টা করেননি। এক

দশক আগে (১৭৬৫) একই অপরাধে, অর্থাৎ জালিয়াতির জন্য ফাঁসির হুকুম হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের। তাঁর মুক্তির জন্য সওয়াল করে দীর্ঘ আর্জি পেশ করে-ছিলেন কলকাতার মাথা-ব্যক্তিরা। সে-ই বোধহয় আমাদের দেশে প্রথম সমবেত-আবেদন। কিন্তু নন্দকুমারের বেলায় তাঁরা চুপ। বোঝা যায়, নানা কারণে নন্দ-কুমার তখন আপন মহলেও বিচ্ছিন্ন। জনতার প্রতিক্রিয়া কিন্তু তবু সমবেদনা-পূর্ণ। অনুষ্ঠান শেষ হতে না-হতে দেখা গেল মাঠ ফাঁকা। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজার নিজস্ব তিনজন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, আর ক'জন ইংরাজ রাজ-পুরুষ। চোখের জল মুছতে মুছতে জনতা প্রথমে ভিড় জমিয়েছে গঙ্গার ঘাটগুলোতে, সেখানে স্নান সেরে ফিরে গিয়েছে যে-যার ঘরে। বিবরণ বলছেঃ কলকাতার অনেক ব্রাহ্মণ সেদিন অনাহারে থাকেন। অনেকে সেদিনই সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ করেন। কারণ কলির-শহর কলকাতা পাতকিভূমি, এখানে ব্রহ্ম-হত্যায়ও দ্বিধা নেই শাসকদের! এই সংস্কার নাকি টিঁকে ছিল বেশ কিছু কাল। নানা কাজে অনেক ব্রাহ্মণ কলকাতায় আসতে বাধ্য হতেন বটে, কিন্তু অনেকেই নাকি জলগ্রহণ করতেন না এই পাপীদের শহরে।

আসামী যখন মহারাজা নন্দকুমারের মতো বিখ্যাত কেউ নন, সামান্য একজন ফকির তখনও কিন্তু কলকাতায় জনতার আচার-আচরণ ইউরোপের জনতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমসাময়িক ইংরাজী কাগজে বলা হয়েছে বটে ফাঁসি দেখতে অনেক লোক জমায়েত হয়েছিল, কিন্তু সব সময় সব অনুষ্ঠানে সত্য সত্যই যথেষ্ট ভিড় হত কিনা বলা শক্ত। হাটে বাজারে বা পাড়ার মধ্যে ফাঁসিমঞ্চ বসালে অবশ্য অন্য কথা।

১৮২৮ সনের জানুয়ারি। এক ফকিরের ফাঁসি। অপরাধ—ক'মাস আগে হাওড়ার ঘাটে সে-নাকি একটি ইংরাজ শিশুকে হত্যা করেছে। ল্যাং নামে এক ইউরোপীয় পর্যটক হাজির ছিলেন ফাঁসির অনুষ্ঠানে। ফাঁসি হয়েছিল নাকি 'স্কুলের মাঠে'। কোথায় কোন্ স্কুলের মাঠে সাহেব তা বলেননি। শুধু বলেছেন, জায়গাটা জেলখানা থেকে খুব দূরে নয়। মনে হয়, মঞ্চ খাটানো হয়েছিল হেস্টিংসেই। যাহোক, দৃশ্য দেখে তো বিদেশী পর্যটক অবাক, ফাঁসি হবে অপ-রাধীর, অথচ কোনও ভিড় নেই। মঞ্চের অদূরে বসে কয়েদি আপনমনে ভাত খাচ্ছে। তার শেষ প্রাতরাশ। অস্ত্রসজ্জিত ক'জন দেশীয় সিপাহী ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তাকে। এক পাশে সহকারী জেলার, তিনি একজন মুসলমান। তার সঙ্গে কালিকলম নিয়ে তৈরী একজন বাঙ্গালী কেরানী। তাঁর দায়িত্ব অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ তৈরি করা। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী জেলারকে একসময় জিজ্ঞাসা করলেন—সব তৈরি?—হ্যাঁ, উত্তর দিলেন জেলার, তবে এখনও তো তার খাওয়া শেষ হয়নি।

—এক মিনিট। চেঁচিয়ে উঠল আসামী। সে দুজনের কথাবার্তার মর্ম বুঝতে

পেয়েছে। এবার সে আরও দ্রুত খাওয়া চালিয়ে গেল। থালার ভাত শেষ হওয়ার পর চোঁ করে আধগ্যালন দুধ খেল। তারপর লাফিয়ে উঠে বলল—তৈয়ার!

আসামী ফাঁসি মঞ্চে। সহকারী জেলার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কিছু বলার আছে? —আছে। উত্তর দিল আসামী। তারপর শুরু হল তার দীর্ঘ উত্তেজিত বক্তৃতা। দর্শক বলছেন—সে-ভাষণ আগাগোড়া মিথ্যায় বোঝাই। কী করে তিনি সেটা বুঝলেন তিনিই জানেন। টানা পঁয়ত্রিশ মিনিট বলার পর সে একটু থামল। বিরতি না মুহূর্তের যতি ঠিক বোঝা গেল না। তার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট ইঙ্গিত দিলেন, পায়ের তলা থেকে সরে গেল তক্তা। লোকটির পা মাটি থেকে আঠারো ইঞ্চি উপরে ঝুলছে!

এখনও কি তা-ই ঝোলে? মাটি থেকে আঠারো ইঞ্চি উপরে! আমরা জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জল্লাদের এখনও ছুটি মেলেনি। শুরু হয়েছিল সেই কবে, এখনও দেশে দেশে অব্যাহত মারণোৎসব। সভ্যতা এখনও জল্লাদকে চিরদিনের মতো জবাব দিয়ে দিতে পারেনি, 'লাল বিধবা'র প্রতি (গিলোটিনের অনেক ডাকনামের একটি—'রেড উইডো') এখনও তার আসক্তি যেন পুরোপুরি কাটেনি। সুতরাং, এখন খবরের কাগজে মাঝে মাঝে উঁকি মারে নিরুত্তাপ নিষ্করুণ সেই দু' অক্ষরের শব্দটি—ফাঁসি। অথবা—'মৃত্যুদণ্ড', বিধাতার ভঙ্গিতে মানুষের মুখে মানুষেরই নিয়তি উচ্চারণ। শীতল এই সব শব্দ যেন খবরের কাগজে সহসা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, কানে ভেসে আসে অষ্টাদশ উনিশ শতকের মতো ঢেঁড়া পেটানোর শব্দ। আমরা নতুন করে জানি ফ্যানসি লেন আর ফাঁসিবাজার স্মৃতিকথা মাত্র নয়। দিকে দিকে এখনও চলছে দড়ির খেলা। কোথায়ও দড়ির বদলে গিলোটিন, কোথায়ও বৈদ্যুতিক কেদারা কিংবা গ্যাস-কামরা, কোথায়ও ফায়ারিং-স্কোয়াড—এই যা।

বিশ্বময় এই খেলার দিকে নজর রেখেছেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান, অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনাল কিছুকাল আগে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন, মোটামুটি এক বছরের মতো সময়ে বিশ্বে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছেন ৬৮০ জন। তার মধ্যে ৩৬৭ জনকে প্রাণ দিতে হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। এ-হিসাব যখন প্রচারিত হয় তখনও ইরানে ফায়ারিং-স্কোয়াড সবে কাজ শুরু করেছে। তবু রাজনৈতিক কারণে ঝুলিয়ে দেওয়া বা উড়িয়ে দেওয়া লোকগুলোর কথা আমরা মোটামুটি জানি। পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো, ইরানে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী হোভেইদা, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ গেরিলা নেতা শোলেমান মালঙ্গুর, ভারতে নকশাল কর্মী ভূমাইয়া কিস্ট গৌড়, কৃষ্ণানচেট্টি, নেপালে 'রাজতন্ত্রের শত্রুরা'! (কৃষ্ণানকে অবশ্য সরকার নকশাল নেতা বলে মানতে রাজি হননি।) কিন্তু জানি না, অ-রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত অগণিত অপরাধীর কথা। এ-বছর এপ্রিলে একটি জাপানী পরিবার হঠাৎ একদিন সকালে একটি পুঁটুলি হাতে

পায়। তাতে কিছু ব্যবহৃত জামাকাপড়। সেই সঙ্গে সরকারী মোহরাঙ্কিত ছোট্ট একটি চিরকুট—অমুক আর বেঁচে নেই। কেন, কলকাতার বাঙালী পাঠক তা জানেন না।

রাষ্ট্রপুঞ্জের আর্থিক এবং সামাজিক বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে (১৯৭৫) দেখা যায় ওই বিশ্বসংস্থার ১৩৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১০২টিতেই তখনও মৃত্যুদণ্ড বহাল। পরবর্তী একটি সংবাদে দেখা যায় জল্লাদের মায়া কাটাচ্ছে আরও কেউ কেউ. বিশ্বের ৭০টি দেশেই নাকি ছুটি দেওয়া হয়েছে তাকে। কোনও কোনও দেশ অবশ্য ছুটি দিয়েছে সাময়িকভাবে। পরিস্থিতিটা বুঝতে হলে চারদিকে একনজর তাকিয়ে দেখা দরকার। আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ১৩টিতে মৃত্যুদণ্ড নেই, নটিতে সাময়িক ছুটি ভোগ করে আবার ফিরে এসেছে ঘাতক। অস্ট্রেলিয়ায় ৬টির মধ্যে ২টি রাজ্যে তাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কানাডায় ১৯৬৭ থেকে পাঁচ বছরের জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল না, '৭৭-এর ডিসেম্বর থেকে আবার চার বছরের জন্য বন্ধ। মেকসিকোয় ৩২টি প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে ২৯টিতেই আইনসম্মত হত্যাকাণ্ড অচল। অস্ট্রিয়া, ভেনিজুয়েলা, আর্জেন্টিনা—ইত্যাদি কয়টি দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীকেও নাকি আর সাজা দেওয়া হবে না। ব্রিটেনের কাহিনী আরও উৎসাহজনক। সেখানে ১৯৬৫ সন থেকে পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বছরের জন্য মৃত্যুদণ্ড বন্ধ ছিল। পাঁচ বছর পরে অভিজ্ঞতার আলোতে পরিস্থিতি যাচাই করে ১৯৬৯ সনে পাকাপাকিভাবে উচ্ছেদ করা হয় ফাঁসিমঞ্চ। এ-বছর (১৯৭৯) নতুন রক্ষণশীল সরকার তাঁদের প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য নতুন করে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তুলেছিলেন মৃত্যুদণ্ড ফিরিয়ে আনা কি সংগত? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—না। জল্লাদের সমর্থনে ভোট পড়েছে যদি ২৪৩টি, তবে বিপক্ষে পড়েছে ৩২৬টি। বোঝা যায়, ব্রিটেন টাইবার্ন আর নিউগেটের স্মৃতি ভুলতে চায়। যমের এই খেড়ো-বাঁধানো খাতাটি চিরকালের মতো ছুঁড়ে দিতে চায় টেমস-এর জলে।

কিন্তু সবাই তা পারল কই? বন্দেরনায়েক গদিতে বসে সিংহল থেকে ফাঁসির উচ্ছেদ করেছিলেন (১৯৫৬)। আর তাঁর হত্যাকেই কৈফিয়ত হিসাবে দেখিয়ে ফাঁসির মঞ্চ ফিরিয়ে আনা হল সে-দেশে ১৯৫৯ সনে। সত্য, এখন আর কোনও দেশেই কথায় কথায় কারও মুণ্ড কাটা পড়ে না। প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের ফর্দ এখন প্রায় সব দেশেই অতিশয় হ্রস্ব। আমেরিকায় এক এক রাজ্যে এক এক রকম আইন। কিন্তু সব আইন ধরলেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে বড়জোর তিরিশটি অপরাধের জন্য। ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় আইনে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে মাত্র তিনটি অপরাধের জন্যঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতা, নরহত্যা, নারী ধর্ষণ। রাশিয়ায় এক সময় মৃত্যুদণ্ড ছিল না, আবার তা ফিরিয়ে আনা হয়েছে 'সামাজিক অপরাধীদের' জন্য। চীনেও 'সামাজিক অপরাধী'দের প্রাপ্য নাকি মৃত্যু। ভারতে ফাঁসি এখন বলতে গেলে একমাত্র খুনীদের জন্যই বরাদ্দ। সবাই জানেন, ভারতে

মৃত্যুদণ্ড উচ্ছেদের জন্য বার বার শোনা গেছে জোরালো সওয়াল। গান্ধীজীর বক্তব্য সুখ্যাত। অন্যরাও আন্দোলন চালাচ্ছেন ১৯৩১ সন থেকে। মৃত্যুদণ্ড উচ্ছেদের জন্য লোকসভায় প্রথম বিল উত্থাপন করেন মুকুন্দলাল আগরওয়ালা, ১৯৫৬ সনে। ১৯৫৮ সনে রাজ্যসভায় একই মর্মে এক বিল পেশ করেন পৃথ্বী-রাজ কাপুর। রাজ্যসভায় আবার একটি বিল ওঠে ১৯৬৯ সনে। সেবার উত্থাপক ছিলেন সাবিত্রী দেবী সিতার। কিন্তু প্রতিবারই সরকারী প্রতিরোধের ফলে পিছু হটে আসতে হয়েছে ওঁদের। ভারতীয় আইন কমিশন ১৯৭২ সনে নিজে-দের সুপারিশে বলেছেন ফাঁসুড়েকে বহাল রাখাই সংগত। তাছাড়া, অধিকাংশ রাজ্যেরও নাকি তা-ই অভিমত। তা-সত্ত্বেও চলতি-বছরে মৃত্যুদণ্ড উচ্ছেদের জন্য আরও একটি খসড়া বিল করা হয়েছে লোকসভার বিবেচনার জন্য। এটি পেশ করেছেন—পি জি মবলঙ্কার। এ-বিলের পরিণতি কী হবে দেশের মানুষ এখনও তা জানেন না। কেন এই প্রতিহিংসাপবাযণতা? এ কি জীবনেব অহেতুক অপচয় নয়? প্রশ্ন তুলেছেন মবলঙ্কার।

আগেই বলেছি কোনও দেশেই আজ আর পান থেকে চুন খসলেই কাউকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় না। ভারতেও না। ১৯৫৫ পর্যন্ত ভারতে খুনীর জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলতে গেলে একমাত্র দণ্ড। ১৯৫৫ সনে দণ্ডবিধি সংশোধন করে বলা হয়—কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল না তা ব্যখ্যা করে দেখাতে হবে। অর্থাৎ, মনে হল সরকার বিকল্প দণ্ড যাবজ্জীবন কারাবাস সম্পর্কেই যেন বেশি আগ্রহী। তারপব ১৯৭৩-এ আর এক দফা সংশোধন। এবার স্থির হল—আদালতকে স্পষ্টভাষায় বোঝাতে হবে কেন এই বিশেষ অপরাধীর বেলায় মৃত্যুদণ্ডই বরাদ্দ করা হল। বোঝা যায ভারত মৃত্যুদণ্ড কমাতে পারলেই খুশি। তবু এদেশে কিন্তু মৃত্যুদণ্ডে খুব ঘাটতি নেই। আমেরিকায় '৩০এর দশকে বছরে গড়ে মৃত্যুদণ্ড হত—১৬৭টি, ৫০'এর দশকে—৭২টি, ১৯৬১-তে হয়—৪২টি। ১৯৬৭'র পরে ওদেশে কাউকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসতে হয়নি। ফরাসী দেশে ১৯৫১ সনে গিলোটিনে মুণ্ড কাটা যায় ১৬ জনের, ১৯৫২ সনে ৫ জনের। ১৯৬৯ থেকে সেদেশে গিলোটিন পুরোপুরি স্তব্ধ। জাপানে—১৯৪৭ থেকে ১৯৭৪ সনের মধ্যে ফাঁসি হয়েছে ৫১৩ জনের। গত বছর (১৯৭৮) ১৭ জনের। আর ভারতে? ১৯৭৪ সনে নাকি ভারতে প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হয ১৬৩ জনের, ফাঁসি হয় ৬৫ জনের, ১৯৭৫ সনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় ৯৫ জন, ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দেন ২৩ জন। তার আগের কয়টি বছরের হিসাব কিন্তু বলছে বছরে গড়ে কমপক্ষে ৫০ জনকে এখনও প্রাণ দিতে হয় ফাঁসির দড়িতে! ফলে বিদেশী সংবাদের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের পড়তে হয় স্বদেশী খবরও: ডিসেম্বর, ১৯৭৫; যারবেদা জেলে ফাঁসি হয়ে গেল খুনী ফিরোজ দারুওয়ালার। সে মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী হামিদ দালওয়াইকে নিজের কিডনী দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিল। ফিরোজের বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা মা এখনও বেঁচে।...

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ; ত্রিচুর। খুনের দায়ে স্কুলের ছেলে। ছেলেটির নাম দেবদাস।... মে, ১৯৭৯ ; জয়পুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসি হয়ে গেল কুখ্যাত শঙ্কারিয়ার। ১৯৭৩-৭৪ সনে সে ৬৬ জনকে খুন করে।...বিল্লা আর রঙ্গার ফাঁসির আদেশ। আমেদাবাদের সেই তরুণদের প্রাণদণ্ডের রায় বহাল।...এবং কখনও বা কলকাতায় তালতলার মোড়ে দেওয়ালে পোস্টার : আলিপুর জেলে ফাঁসির জন্য অপেক্ষা করছেন মলিনা ঢক আর শান্তিময় অঙ্কুরে!

রাষ্ট্রপতি অবশ্য এঁদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়েছেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)। স্বস্তিকর সংবাদ—এই রাজ্যের জেলখানাগুলোতে গত তেরো চৌদ্দ বছর ফাঁসির কোনও ঘটনা নেই। পশ্চিমবঙ্গে শেষ ফাঁসি নাকি আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে, ১৯৬৫ সনের এপ্রিলে। তবে হ্যাঁ, ফাঁসিমঞ্চগুলো এখনও রয়েছে। প্রতি বছর যথারীতি সেগুলোর সেবাযত্নও করা হয়,—জানে কখন আবার জল্লাদকে ডাকতে হবে! আর, যন্ত্রটিকে চালু রাখতে গিয়েই নাকি হঠাৎ বিপত্তি, পশ্চিমবঙ্গের জেলখানায় বহুকাল পরে আবার ফাঁসি। ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান জেলে। কর্মীরা সরকারী নিয়মমাফিক বেকার ফাঁসি যন্ত্রটিকে চালু রাখার জন্য তদারকি করছিলেন এমন সময় একজন কয়েদি ছুটে গিয়ে খেলাচ্ছলে নিজের গলায় জড়িয়ে নিল দড়িটি। মুহূর্তে সব শেষ। আত্মহত্যা? আহাম্মুকি? কে জানে!

কে জানে, কোথায় চার দেওয়ালের আড়ালে কী হচ্ছে। ইংলণ্ডে ফাঁসির পরে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখার প্রথা বন্ধ হয়ে যায় ১৮৩৪ সনে। প্রকাশ্যে ফাঁসির প্রথার উচ্ছেদ ১৮৬৮ সনে। প্রথমে দণ্ডিত অপরাধীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হত সে যেখানে অপরাধ করেছিল সেখানে। তারপর সে-রীতি বদলে গড়ে তোলা হয় ফাঁসিবাজার। যথা: টাইবার্ন, নিউগেট, কিংবা কলকাতার কুলিবাজার, লাল-বাজার। অথবা আসামের সেই ফাঁসিবাজার। তারপর উনিশ শতকের অপরাহ্নে পৌঁছে চৈতন্যোদয় জল্লাদকে ইঙ্গিত করা হল তার সাজসরঞ্জাম নিয়ে ওই উঁচু দেওয়ালের আড়ালে চলে যেতে। সেই থেকে টেমস এবং গঙ্গাতীরে এই রীতি। সম্প্রতিকালে প্রকাশ্যে ফাঁসির একমাত্র ঘটনা বোধহয় পাকিস্তানের লাহোরে, গত (১৯৭৮) মার্চ মাসে। খুনের দায়ে তিনজন অপরাধীকে সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে লক্ষ লক্ষ লোকের চোখের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ফাঁসিকাঠে। এ-ঘটনা অবশ্যই ব্যতিক্রম। নিয়ম—জনতার চোখের আড়ালে চুপি চুপি কাজ শেষ করে ফেলা। প্রত্যেকের আপন ঠোঁটের ওপর আপন অঙ্গুলি—চুপ!

আগে নাকি নির্দিষ্ট দিনে জেলে কালো পতাকা উড়ত। ঘণ্টা বাজত। ফটকে ঝুলত সরকারী বিজ্ঞপ্তি। এখন সে-সবের পাট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র যাঁরা সেই ভয়াবহ ঘটনার সংবাদ রাখতেন বিলাতে শেষদিকে তাঁদেরই দেখা যেত সকাল ৯টায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন জেল গেটে। ওঁরা মৃত্যুপথযাত্রীর বন্ধু,

আত্মীয়, কিংবা এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদী। ঘন ঘন তাঁরা ঘড়ি দেখেন। তারপর একসময় মাথার টুপি খুলে ঘাড় হেঁট করে চোখ বুজেন। তারপর জেলের ঘণ্টায় হাত দেন। ওঁরা ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়ান। এঁরা নিঃশব্দে হাতের ফুলের তোড়াগুলো ওঁদের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেন।

দেওয়ালের আড়ালে অনুষ্ঠান হয়তো তখনও শেষ হয়নি। এ-অনুষ্ঠান বড়ই জটিল। আদালত থেকে দণ্ডাদেশ নিয়ে ফেরার পর ফাঁসির আসামীকে রাখা হয় স্বতন্ত্র সেলে। দু'জন প্রহরী চব্বিশ ঘণ্টা তার ওপর নজর রাখে। ব্রিটেনে সরকারী নির্দেশ—তাকে ফুর্তিতে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাস, দাবা, এসব খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হয় তাকে। জেলের অফিসাররা পালা করে খেলতে বসেন তার সঙ্গে। খবরের কাগজ, বই—এসবও পায় ফাঁসির আসামী। প্রায় প্রতিদিন এক পাঁইট করে বীয়ার, এক প্যাকেট সিগারেট কিংবা এক আউন্স পাইপের তামাক। তাকে জেলখানার প্রধান হেঁসেল থেকে খাবার পাঠানো হয়। বেশ ভাল খাবার, যাকে বলে 'হসপিটাল ডায়েট'। ডাক্তার নিয়মিত পরীক্ষা করে যান তাকে। তাকে সুস্থ রাখা দরকার। কেননা, বিশেষ দিনটিতে তাকে 'মঞ্চ অবধি নিজের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সমস্ত জেলে ব্যস্ততা। অন্য দিকে নিস্তব্ধতা। রাত ১২টায় আসামীকে ডেকে তোলা হয়। স্নান করানো হয়। নতুন জাঙিয়া কোর্তায় সাজানো হয়। —এ বিবরণ বাংলার জেলের। জরাসন্ধের রচনায় একটা রূপরেখা পাওয়া যায় মাত্র। ব্রহ্মের জেলের আবহাওয়ার সংবাদ মেলে জর্জ ওরওয়েলের লেখায়। সেসব শোনাবার সুযোগ এখানে নেই। ব্রিটিশ জেলের টুকরো টুকরো বর্ণনা থেকে ভোরের ছবিটি অনেকটা এইরকম:

ফাঁসির একঘণ্টা আগে কয়েদীর ঘরে ঢোকেন জেলের যাজক। কয়েদীকে দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসিয়ে তত্ত্ব কথা শোনান তিনি। উদ্দেশ্য—জল্লাদের আগমন যেন তার চোখে না-পড়ে। দশ মিনিট আগে আসেন জেলের অধ্যক্ষ, গভর্নর, তাঁর পিছু পিছু শেরিফ, মেডিকেল অফিসার। তারপর জল্লাদ স্বয়ং। তার সঙ্গে সহকারীরা। হাত বাঁধা হল। মাথায় সাদা টুপি বসানো হল। মেয়ে হলে বন্দীকে পরানো হয় ওয়াটারপ্রুফ আণ্ডারওয়্যার। তারপর বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয় মঞ্চে। পাটাতনে চক দিয়ে বৃত্ত আঁকা, বন্দীকে পা রাখতে হবে সেখানে। সহকারী জল্লাদ তার পা দুটোও বেঁধে ফেলল। তারপর গলায় পরিয়ে দেওয়া হল ফাঁস। ছয় ফুট লম্বা সেই দড়িটা। এমনভাবে সেটি লাগাতে হবে যাতে গিঁটটি ঠিক বাঁ চোয়ালের নিচে পড়ে। যাদের মাথা চোয়াল বা গলার গড়ন বিকৃত, ফাঁসের পক্ষে অসুবিধাজনক, তারা অনেক সময় ছাড়া পেয়ে যায়। ১৯৪৯ সন পর্যন্ত এ-সব কারণে মুক্ত দণ্ডিত আসামীর সংখ্যা—পনেরজন। ১৮৫৫ জনে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বার বার তিনবারের চেষ্টায়ও তাকে মারা যায়নি বলে। সুতরাং, আগে থাকতেই ব্যবস্থাদি সব নিখুঁত রাখা চাই। নয়তো

গোলমাল।

গোলমালও হয় বইকি! নানা ধরনের বিপত্তি। ব্রিটিশ রয়াল কমিশনের বিবরণে খুঁজে পাওয়া যাবে তার নানা নজির। হয়তো দড়ি ছিঁড়ে গেল। একবার নতুন দড়ি খুঁজে বের করতে ঘাতকদের সময় লেগেছিল নাকি পাক্কা চব্বিশ মিনিট। মিনিটগুলো ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কখনও বা ফাঁসির বদলে মুণ্ডচ্ছেদ! তাও হয়েছে ব্রিটেনের জেলখানায। তবে রয়াল কমিশনের কাছে চিকিৎসকরা বলেছেন মুণ্ডচ্ছেদ হামেশা না হলেও প্রকৃত অর্থে আদর্শ ফাঁসি হয় কালে-ভদ্রে। ফাঁসিতে ঘাড় মটকে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওঁরা পরে পরখ করে দেখেছেন মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ। তাছাড়া অন্য ঝামেলাও বাঁধে। শেষ মুহূর্তে আসামী অনেক সময় ক্ষেপে যায়। বেরী নামে একজন জল্লাদ জানায়—দু'জন নারীকে ফাঁসি দিতে তাকে খুবই ঝামেলা পোহাতে হয়। তাঁদের সে কী আর্ত-নাদ। জোর করে নিয়ে যেতে হল মঞ্চে। অনেক সময় আসামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মঞ্চে উঠেও মূর্ছা যায়।—তখন কী করা হয়? প্রশ্ন তুলেছিলেন রয়াল কমিশন। —আমরা তাকে বয়ে নিয়ে আসি। —আমরা তাকে চেয়ারে বসিয়ে কিংবা ধরে রেখে ঝুলিয়ে দিই! উত্তর দিয়েছিল ব্রিটেনের বিখ্যাত জল্লাদ পিয়ের-পয়েন্ট। —ঝুলিয়ে দিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে তার কোনও কথা নেই। আইনত সময় লাগার কথা কয়েক সেকেন্ড, কিন্তু অনেক সময় ঝুলিয়ে রাখতে হয় পাকা এক ঘন্টা। নিজের হাতযশের বিবরণ দিয়েছে ব্রিটিশ জল্লাদ, যারা একবারে মরে না, দরকার হলে আমরা দ্বিতীয়বার নতুন করে ঝুলিয়ে দিই। দরকারে পা-ধরে টান দিই।

রয়াল কমিশনের রিপোর্ট পড়লে বোঝা যায় মারণ-যন্ত্রটিকে যতই নিখুঁত করার চেষ্টা হয়ে থাক না কেন, ফাঁসি হত্যাকাণ্ড হিসাবে এখনও মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়। হাতে ওদের পুরোহিত-দর্পণ থাকলেও অনুষ্ঠানে প্রায়শ ঘটে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি। অতএব ভুট্টোর স্ত্রী কিংবা অনুরাগীরা যখন বলেন ভুট্টোর আদৌ ফাঁসি কাঠে মৃত্যু হয়নি তখন কেউ কেউ নিশ্চয়ই থমকে দাঁড়াতে চাইবেন। অত্যাচারের ফলে ভুট্টো কি আগেই জেলে মারা যান? অথবা মুমূর্ষু ভুট্টোকে কি স্ট্রেচারে করে তোলা হয়েছিল মঞ্চে? কী তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি? তারা-মাসির জবানবন্দীর পরেও প্রশ্নচিহ্নগুলো বোধহয় থেকেই যায়। কেননা, ব্রিটিশ জল্লাদ পিয়েরপয়েন্টের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় দেওয়ালের আড়ালে অনেক অবিশ্বাস্য কাণ্ডই ঘটতে পারে। ঘটে। পিয়েরপয়েন্ট বলেন—দৃশ্য দেখে কোনও কোনও জেল-কর্মী অসুস্থ বোধ করলে। ব্যবস্থাদি শেষ করেই ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়েন মহিলা অফিসাররা!

তবু জল্লাদ। তবু পেশাদার ঘাতক। হ্যাভলক এলিস প্রশ্ন তুলেছিলেন—জজ কেন নিজেই ফাঁসি দেন না? কেন, তাঁর হয়ে মৃত্যুর দূত সাজবে পেশাদার জল্লাদ। সামান্য পয়সার লোভ দেখিয়ে কেন এভাবে মনুষ্যত্বের অবমাননা?

বলাই বাহুল্য, সাধারণত কোনও জল্লাদের মনে এসব প্রশ্ন ওঠে না। একালের জল্লাদের মনে এসব প্রশ্ন ওঠে না। একালের অধিকাংশ জল্লাদের কাছেই এটা নিছক একটা পেশা মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ-পেশা আবার পারিবারিক। যেমন ফরাসী দেশের সাঁস (Sanson) পরিবার। সেই কবে হেনরি সাঁস নামে যুবকটি জল্লাদ ডিপির (Dieppe) সুন্দরী মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল তার পর থেকে দু'শ বছর ধরে মানুষ মেরেই পেট চালাল ওরা। অবশ্য সসম্মানে। ব্রিটেনে ডিকসিনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফিতে ঠাঁই পেয়েছেন চারজন জল্লাদ। সাঁসদের নিয়ে মোটা মোটা বই লিখেছেন ভিক্টর হুগো থেকে শুরু করে একাল পর্যন্ত অনেকেই। ফরাসী বিপ্লবে ওরাও কখনও কখনও নাম ভূমিকায়। এক চার্লস হেনরি সাঁসকেই ৫০২ দিনে মুণ্ডচ্ছেদ করতে হয়েছিল ২৬৩২ জনের। তার হাতেই কাটা পড়েন চতুর্দশ লুই। রানীকে অবশ্য হত্যা করেছিল পুত্র হেনরি। মারি আতোনেত হেনরির পা মাড়িয়ে দিয়েই বলেছিলেন—'পারডন, মঁসিয়ে!' শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই গৌরবময় (!) ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেনি ওরা। পরবর্তীকালে ঋণের দায়ে উচ্ছন্নে যায় সাঁস পরিবার। একটি বইতে পড়ছিলাম সাঁসদের উপসংহার কাহিনীঃ ঘর থেকে গিলোটিন নিয়ে চলেছেন একজন সাঁস। কোনও সরকারী হুকুম তামিল করতে নয়, বিক্রি করে কিছু নগদ পয়সা সংগ্রহ করতে!

পিয়েরপয়েন্টরাও এ-পেশায় বেশ পুরোনো। রয়াল কমিশনের কাছে এই বিখ্যাত ব্রিটিশ ঘাতক বলেন—সে এ পেশায় দীক্ষা নিয়েছে তার খুড়োর কাছে। খুড়ো শিখেছে তার বাবার কাছে। পিয়েরপয়েন্ট বলে—তার মতো অভিজ্ঞ ফাঁসুড়ে একালে কেউ নেই। সেটা নিছক ফেনিয়ে বলা নাও হতে পারে। নুরেমবার্গেও সে ছিল নাকি অন্যতম ঘাতক। আমাদের দেশের জল্লাদেরাও প্রায়শ পারিবারিক পেশা হিসাবেই বেছে নেয় জল্লাদের কাজ। কিংবা বেছে নিতে বাধ্য হয়। নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য জল্লাদ আনা হয়েছিল নাকি বাংলার বাইরে থেকে। তারামাসির বাবা নাকি ফাঁসি দিয়েছিল ভগৎ সিংকে। কিছুকাল আনন্দবাজার পত্রিকায় শিবনাথ মল্লিক ওরফে শিবুডোম নামে এক জল্লাদের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জানা যায়—কলকাতার এই জল্লাদ পরিবারটিরও আদি ঠিকানা বিহার। বাবা মিছরিলালেরও নাকি এটাই ছিল পেশা। শিবুর দাবি—১৯২০ থেকে ১৯৭০ এই পঞ্চাশ বছরে কমপক্ষে সে ছয়শ লোককে ফাঁসি দিয়েছে। ১৯৩৪ সনে তার হাতেই মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি। মাস্টারদার ফাঁসি হয়েছিল কি? নাকি অন্য কোনও ভাবে তাঁর মৃত্যু? জনমনে ধারণা অন্য রকম। যাহোক, শিবুডোম বলে—সে তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিল। তার চেয়েও লক্ষণীয় তার আর একটি উক্তি। সে নাকি বলে—তার বাসনা ছেলে নাটাও হোক ফাঁসুড়ে। উত্তর প্রদেশেও রয়েছে একটি ফাঁসুড়ে পরিবার। কিছুদিন আগে তারা আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে—দিন আর চলে না। দোহাই লাগে,

হুজুররা আমাদের একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। শিবুর নাকি মন খারাপ, মাস্টারদার ফাঁসির দিনে। নয়তো কোনও দিন ওসব ব্যাপার নিয়ে ভাবেনি সে। যার যা কাজ। বিশ্বাস করা যায় এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি হাজারিবাগের জল্লাদ এলাচি ডোমের কথা। সে তখন বৃদ্ধ। দিনরাত মদ খেতো আর হো হো করে হাসত। সেও নাকি অনেক ফাঁসি দিয়েছে নিজের হাতে। লুসাই সর্দাররা। মণিপুরের বিদ্রোহীরা।

তার মানে এই নয় যে, বাপঠাকুর্দা জল্লাদ না-হলে কেউ জল্লাদের কাজ করতে চায় না। এই সেদিন অবধিও কিন্তু অনেকেই চাইত। ব্রিটেনের আর এক বিখ্যাত জল্লাদ বেরি। তার একটি স্মৃতিকথাও আছে। সে জল্লাদের কাজ নেয় ১৮৮৩ সনে। সেবার প্রার্থী ছিল ১৩৯৯ জন! পরবর্তীকালে অবশ্য ব্রিটেনে একাজের জন্য আর বিজ্ঞাপন দেওয়া হত না। তবু পঞ্চাশের দশকেও ব্রিটিশ হোম-অফিসকে গর্ব করে বলতে শোনা গেছে সপ্তাহে গড়ে ওঁরা এ-কাজের জন্য পাঁচটি করে দরখাস্ত পেয়ে থাকেন। কেউ কেউ এমন-কি বিনা পয়সায় পর্যন্ত কাজ করতেও সম্মত!

জল্লাদরা যে খুব বেশি পয়সা রোজগার করে এমন নয়। ব্রিটেনে প্রতিটি ফাঁসির জন্য প্রাপ্য ছিল দশ পাউন্ড। সহকারী পেত তিন গিনি। তাছাড়া যাতায়াত খরচ, খাওয়া খরচ। উনিশ শতকের তুলনায় বলতে গেলে খুবই কম রোজগার। শিবু ডোম নাকি পেত ইংরাজ আমলের শেষদিকে প্রতিটি ফাঁসির জন্য সাঁইত্রিশ টাকা। সেই সঙ্গে রাহা আর খাওয়া খরচ বাবদে কিছু। লোকমুখে শুনেছি কোনও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত আসামীকে দিয়ে এ-কাজ করালে তার মেয়াদ থেকে তিনমাস কাটা যেত। হাতে নগদ দেওয়া হত দেড় টাকা।

তবু, কী আশ্চর্য, এই সেদিন অবধিও জল্লাদের অভাব নেই কোথাও! রাষ্ট্রীয় প্ররোচনায় সানন্দে তারা ঘাতকের ভূমিকায়। সানন্দে বলছি, কারণ পিযেরপয়েন্ট বলে—সে মনে করে এটা তার পবিত্র কর্তব্য। ম্যানচেস্টারে তার একটি পানশালা ছিল। তার নাম—'হেলপ দি পুওর স্ট্রাগলার!' তার সহকারীর পানশালাটির নাম—'দি রোপ অ্যান্ড অ্যানকার'। জন এলিস নামে আর এক ব্রিটিশ জল্লাদের পানশালার সাইনবোর্ড—'দি জলি বুচার!'

সব জল্লাদ অবশ্য সমান সুখী এবং তৃপ্ত নয়। সবাই এক ধাতুতে গড়া নয়। সকলের মেজাজ এবং বরাতও একরকম নয়। আগে আগে ঘাতকের মাথায়ও কখনও কখনও নেমে আসত মৃত্যুদণ্ড। উনিশ শতকে জার্মানীতে দুজনের এই দণ্ডভোগ করতে হয়। একজন জাল টাকা বানাত, অন্যজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহের। মারভেল নামে একজন ব্রিটিশ জল্লাদকে ঝোলানো হয়েছিল ফাঁসিকাঠে। এ ধরনেরই কোনও অপরাধ, জালিয়াতি কিংবা রাহাজানি। সে তখন টার্বানের পথে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে ফাঁসি দিতে। পথেই সরকারী বার্তাবহ এসে হাতে গুঁজে দিল মৃত্যু-পরোয়ানা। আরভেল নাকি মঞ্চে দাঁড়িয়ে

জানতে চেয়েছিল জনতা কোন্‌টা আগে দেখতে চায়, অপেক্ষমাণ কয়েদিদের ফাঁসি, না তার? দর্শকরা আবদার জানায়—তার! মারভেল ইতস্তত করে। ফলে দর্শকরা ক্ষেপে গিয়ে হাঙ্গামা বাধায়। মারভেল তাদের হাতে নিগৃহীত হয়। সে রীতিমত আহত। তবু রাজ-আজ্ঞা যখন, ঝুলতেই হল।

জল্লাদ কখনও কখনও বিদ্রোহও করে। শোনা যায় ১৯০৮-এ মজফ্‌ফরপুরে জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে হঠাৎ বেঁকে বসে ছিল জেলের ঘাতক। সে নাকি সাফ জানিয়ে দেয় তার দ্বারা এ-কাজ সম্ভব হবে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণ জেলার নিজেই নাকি হাত লাগান যন্ত্রে। সে-খবর জানাজানি হয়ে যায়। ফলে ভদ্রলোক জাতিচ্যুত হন। কয়েদীরা পর্যন্ত নাকি ওঁর বাড়ি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তিনি বারাণসীতে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে আসেন।

ব্রিটিশ ঘাতক জন ইলিসের কথা আগে বলেছি। শহরের বাইরে কোনও জেলখানায় ডাক পড়লে সে প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া দাবি করত। তাছাড়া ট্যাকসি ভাড়া চাই। চাই—ভাল খাওয়াদাওয়া। ফাঁসিপিছু তার চার্জ ছিল ১০ গিনি। অপরাধীকে শেষ মুহূর্তে মাফ করে দিলে তার জন্য তাকে দিতে হত অর্ধেক—৫ গিনি। ইলিসের দিন ভালই কাটছিল। রীতিমত ব্যস্ত ঘাতক সে। কিন্তু বিভ্রাট বাধল ১৯২৪ সনে মিসেস থমসন নামে একটি মহিলার ফাঁসি দিতে গিয়ে। মেয়েটি ক্রমাগত চেঁচিয়ে বলছেন—তিনি নির্দোষ। তিনি বাঁচতে চান। অবর্ণনীয় দৃশ্য। বলতে গেলে জবরদস্তি করেই তাকে হত্যা করেছে ইলিস। তারপরই অনুতাপের আগুন। ইলিস স্বেচ্ছায় তার পদত্যাগ পত্র পেশ করে, সে আর জল্লাদের কাজ করতে চায় না। তবু মনে শান্তি নেই। ইলিস এবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। প্রথমবার সে ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর তাকে আটকে রাখা গেল না। বিবেকবান জল্লাদ শেষ পর্যন্ত শান্ত হল নিজেকে খুন করে। সে-বছরই জার্মানীতে একজন পেশাদার ঘাতক আত্মঘাতী হয়। তার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে যাকে নিয়োগ করা হল, কিছুকাল পরে সেও আত্মহত্যা করে বসল। মরার আগে তার ঘরে সে নাকি এক বিচিত্র অনুষ্ঠান। যে কজন অপরাধী তার হাতে মারা পড়েছে তাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে একটি করে মোম-বাতি জ্বালিয়ে নিজের প্রাণ কেড়ে নিল জল্লাদ।

পেশাদার জল্লাদ নাকি ইদানীং ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। ভুট্টোর জল্লাদ তারামাসিকে আনা হয়েছিল বাহাওলপুর থেকে। শোনা যাচ্ছে তাকে বিদেশেও ডাকাডাকি করা হচ্ছে। ক'বছর আগে সিঙ্গাপুরে ওঁদের জল্লাদ খুঁজতে হয়েছে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে। কখানা দরখাস্ত পড়েছিল জানি না। তবে শেষ পর্যন্ত ওঁরা কাউকে না কাউকে পেয়ে গেছেন নিশ্চয়ই।

—কিন্তু কেন? কেন এভাবে একজন সরল সাধারণ মানুষকে আমরা ঠেলে দিচ্ছি জল্লাদের গৌরবহীন ভূমিকায়? তার উত্তরে অনেক কথাই বলা চলে। যুগের পর যুগ, শতকের পর শতক ধরে বলা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। গদীয়ানদের

ঠোঁটের ডগায় অনেক যুক্তি। যুক্তিগুলো অনেকটা এই রকম ঃ

মানুষ মাত্রই স্বাভাবিক মানুষ নয়। কেউ কেউ জাত-অপরাধী। কারও বা প্রবণতা অপরাধের দিকেই। সমাজ শরীরে এরা দুষ্ট কোষের মতো, সুতরাং সমাজের হিতে তাদের সরিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। সে-অধিকার সমাজের নৈতিক অধিকার, পবিত্র অধিকার। কাজটা ধর্মবিরুদ্ধ তো নয়ই, বরং বলা চলে এই ন্যায়ধর্ম পালনে ব্যর্থ হলে সমাজ ধর্মচ্যুত হবে। সমাজের বিরুদ্ধে কেউ হিংসা প্রকাশ করলে সমাজ যদি প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখায় সেটা আদৌ নিন্দনীয় নয়। কেউ কেউ বলেন—বরং সেটা প্রশংসাযোগ্য। এই পবিত্র-ক্রোধ সভ্যতার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সত্যকারের সভ্যতার এটাও এক বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ। সুতরাং, বেশ ভেবেচিন্তেই ওঁরা বলেন—জল্লাদকে ছুটি দিলে সমাজের নির্ঘাৎ বিপদ।

কেননা, প্রাণদণ্ড অপরাধ দমনে শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধক। তার কোনও বিকল্প নেই। হয় না। ফাঁসির হাট ভেঙে দিলে খুনখারাপি বেড়ে যেতে বাধ্য। অপরাধী-দের তখন পোয়াবারো। বিশ্বময় অপরাধ বাড়ছে। এসময়ে জল্লাদকে ছুটি দিলে শান্তিতে বাস করা দুঃসাধ্য। সুতরাং, কোনও ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া, জনমতেরও দাবি এটাই। পথের মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, সেও বলবে হ্যাঁ, জল্লাদ চাই বই কি! শুধু কি তাই? বিজ্ঞরা প্রশ্ন তোলেন—অপরাধীর জন্য এত মায়াকান্না, খুন যারা হল তাদের পরিবার পরিজনের দিকটাও কি ভেবে দেখা সংগত নয়?

প্রতিটি প্রশ্নেরই মুখের মতো জবাব দিয়েছেন প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদীরা। এখনও দিচ্ছেন। সে-সব যুক্তি শোনার আগে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী এবং মনস্তাত্ত্বিকরা কীভাবে সরকার-বিচারক-পুলিসের কথা জল্লাদদের সমর্থক-দের ওই সব সারবান যুক্তির নির্যাস বের করেছেন তাও শুনে রাখা ভাল। ওঁরা বলেন—ফাঁসির অনুষ্ঠান আসলে আদিম প্রেতনৃত্যেরই রকমফের। মৃত্যুর উৎসব। অতএব জমানো হয়েছিল ফাঁসিবাজার। এখন যা ঘটে, ঘটে চোখের আড়ালে। কিন্তু উৎসব তবু জমে ওঠে খবরের কাগজের পাতায়। আমরা এসব খবব পড়তে ভালবাসি কারণ আমাদের মনের গভীরে বাসা বেঁধে আছে গোপন হিংসা। নিজেদের পাপবোধকে আমরা মনে মনে চাপিয়ে দিই দণ্ডিত অপরাধীর মাথায়। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে যেন। ফাঁসি মঞ্চে যে দাঁড়িয়ে আছে সে প্রবাদের বুধো। আর আমরা নির্ভেজাল ভাল মানুষ সেজে থাকা উদোর দল। আমাদের হাতে রক্তের ছোপ নেই। সুতরাং, অনায়াসে রায় দিয়ে দিই—ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে!

এবার যুক্তিতর্কের কথা।

ফাঁসি কি প্রতিরোধক? কার ফাঁসি? কবে? কোন্ দেশে? মংগল পাণ্ডে থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, ভগৎ সিং, সূর্য সেন—হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের ফাঁসি কি জাতির পক্ষে ঘুমের ঔষধ, না জাগরণের আহ্বান?

সব দেশেই তা-ই। ওঁরা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যান। জাতি জাগে। বীরের রক্তস্রোত আর মায়ের অশ্রুধারায় পিচ্ছিল পথে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। যদি সাধারণ অপরাধীদের কথাই ধরা যায় তাহলেও কিন্তু মেঝেয় বুট ঠুকে কেউ বলতে পারবেন না ফাঁসি হওয়ার চিন্তায় হবু অপরাধীদের চোখে ঘুম নেই। খুন যে করতে যাচ্ছে তার কাছে এসব জুজুর ভয় মাত্র। অথবা পরীদের গল্পের মতো।

বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে খুন করা না-করার বিশেষ সম্পর্ক নেই। এমন কোনও কথা নেই যে, মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দিলেই দেশে খুন-খারাপি বেড়ে যাবে, মৃত্যুদণ্ড বহাল আছে বলেই কোনও দেশে খুন কম হচ্ছে। ইংলণ্ডে অন্য অনেক দেশের তুলনায় খুন কম হত। সে কি ইংলণ্ডে মৃত্যুদণ্ড বহাল ছিল বলেই? মোটেই তা নয়। হল্যাণ্ডে ১৮৬০ সনে ফাঁসি মঞ্চটিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। সেখানে খুন কিন্তু ইংলণ্ডের তুলনায় আরও কম। অন্যদিকে, আমেরিকায় যেখানে অনেক অঙ্গরাজ্যেই জল্লাদ সক্রিয় সেখানে খুনের পরিমাণ কিন্তু হল্যাণ্ডের দশগুণ বেশি। যে-সব দেশ বেশ কিছুকাল আগেই জল্লাদকে জবাব দিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ রয়াল কমিশন ১৯২৯ সনে তাদের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন। তাঁরা একবাক্যে বলেন—না, মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ায় আমাদের বাড়তি ক্ষতি কিছু হয়নি। ব্রিটেনে দ্বিতীয় রয়াল কমিশন বসে ১৯৪৯ সনে। তাঁদের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বিশিষ্ট মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী বলে-ছিলেন—যেসব দেশ বা রাজ্য মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে বা বহাল রেখেছে তাদের অপরাধের পরিসংখ্যানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—খুনখারাপির মতো অপরাধ সংঘটিত হয় অন্য কোনও কারণে, তার সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড থাকা না-থাকার কোনও সম্পর্ক নেই। রয়াল কমিশনও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন—হ্যাঁ, খুনোখুনির সঙ্গে ফাঁসুড়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শক্ত বটে!

সত্যই শক্ত। কেননা, সাধারণত খুন যারা করে তারা পেশাদার অপরাধী নয়। খুনী হয় তারা সাধারণত ঝোঁকের মাথায়, সাময়িক উত্তেজনায়। ব্রিটেনে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সনের মধ্যে যে ১০৬ জন খুনীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ২২ জন খুন করেছে নিজের পরিবারের পরিধির মধ্যে, ২৫ জন প্রণয়ী কিংবা প্রণয়িনীকে। ৪৯ জন ছিল শারীরিক-মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। আর ১৩ জন অপ-রাধী যারা অপরিচিত মানুষকে খুন করেছে তারাও নাকি তা করেছে বাধ্য হয়েই, নিজেদের প্রাণের দায়ে। সুতরাং, বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছেন খুন স্বভাব-অপরাধীর কর্ম নয়, এই প্রবণতার মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিহিত অপরাধীর বিষণ্ণ হতাশ এবং দুঃখজনক পরিমণ্ডলের মধ্যেই। কদাচিৎ তাদের মাথায় উঁকি দেয় জল্লাদ বা ফাঁসির দড়ির কথা। সেটা ভাবতে পারে বরং পেশাদার অপরাধী। সে জেল খেটেছে। সুতরাং, তার জেলের ভয় কেটে গেছে। ফাঁসিকে সে হয়তো ভয় পায়। তবে অনেক অপরাধী নাকি চায় তার বিরুদ্ধে

মৃত্যুদণ্ডের দাবি উঠলেই ভাল, কারণ তাতে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ছেড়ে দেওয়া খুনী সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, এই যুক্তিও নাকি নিতান্তই অসার। দেখা গেছে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীরা কারাগারে তুলনায় অনেক বেশি শান্ত নম্র ভদ্র। তাদের অপরাধ মার্জনা করলে, অর্থাৎ ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম দিলে বেরিয়ে এসে খুব কম ক্ষেত্রেই তারা অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাঁধায়। ব্রিটেনে ১৯৩০-১৯৪৯ সনের মধ্যে ১৮৩ জন খুনের আসামীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তারা কেউ দ্বিতীয়বার খুন করেনি। ১৯৫৬-১৯৬০-এর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় ৭৬ জন খুনীকে। তারাও নতুন কোনও উদ্বেগ সৃষ্টি করেনি। ১৯৫৬ সন পর্যন্ত মুক্ত দণ্ডিত-খুনীদের মধ্যে দুজন মাত্র দ্বিতীয়বার খুনের দায়ে পড়েছে। সেটা মুক্তির আগে বাছাইয়ে ভুলের জন্যও তো হতে পারে। আমেরিকার অভিজ্ঞতাও তা-ই। খুনী ছাড়া পেয়ে আবার খুনে মাতে দৈবাৎ। বিবরণ শুনে মনে পড়বে প্রিন্স ক্রোপটকিনের উক্তি। —তিনি বলেছিলেন—আমরা জানি পূর্ব সাইবেরিয়া ভূতপূর্ব খুনীতে বোঝাই। কিন্তু আমি জানাচ্ছি, রাশিয়ায় ভ্রমণ বা বাসের পক্ষে এমন আদর্শ অঞ্চল আর হয় না!

ফাঁসির যাঁরা উচ্ছেদ চান তাঁদের তূণে আরও কিছু কিছু তীক্ষ্ণ শর রয়েছে। তাঁরা বলেন—মৃত্যুদণ্ড খুনীকে তো নিরস্ত করেই না, বরং পরোক্ষে উদ্বুদ্ধ করে ফাঁসি যেতে। আমেরিকায় এমনও দেখা গেছে শহরের এক প্রান্তে যখন কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে অন্য প্রান্তে তখন খুনী নিজের কাজ করছে। তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জনচক্ষে অপরাধীও 'হিরো'। বড় কিছু চমকপ্রদ কিছু যারা করতে পারে না তাদের কাছে খুনীরাও এক ধরনের বীর। বীর-পূজার অনেক কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। অষ্টাদশ শতকের ব্রিটেনে এমন কুখ্যাত দস্যুর কাহিনী আছে যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বড়ঘরের মহিলারা পর্যন্ত ব্যাকুল। সে টাবার্নের পথে যাত্রা করেছিল নতুন রঙীন পোষাক পরে। আর একজনের দণ্ডাদেশ শোনার পরে সুন্দরী মেয়েরা ভিড় করেছিলেন কয়েদখানায়, কেউ কেউ মুখোস পরে। আমেরিকায় এমন খুনী দেখা গেছে যার পকেটে অন্য খুনীর প্রতিকৃতি। সে তার 'হিরো'। এমন খুনীর দেখা মিলেছে ধরা পড়ার পর প্রথমেই সে খবরের কাগজ চায়। দেখতে চায় কাগজে তার ছবি কেমন দেখাচ্ছে, ঘটনার বিবরণই বা কেমন করে লেখা হচ্ছে! প্রমাণ আছে স্বচক্ষে ফাঁসি দেখার পরও কেউ কেউ খুনী হয়েছে। প্রমাণ আছে অন্তত দু' চারটি ক্ষেত্রে অন্তত দড়ির ফাঁস বড়শির মতো কাজ করেছে।—তোমাকে খতম করে ঝুলে পড়ব। এই হুমকির মধ্যে ফাঁসির রোমান্টিক আবেদনও কি লুকিয়ে নেই?

হ্যাঁ, যারা খুন হয় তাদের পরিবার পরিজনের প্রতিও সমাজের কিছু কর্তব্য আছে। কিন্তু খুনের বদলে খুন করে কি অশ্রুমোচন সম্ভব? সেটা কি নিছক

প্রতিহিংসা নয়? তাতে ওই সব পরিবারের কী লাভ? এভাবে এই বদলা-নেওয়া সে তো নিছক কুসংস্কারের তোষণ। তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী বিপন্ন পরিবারের সুরক্ষা এবং সযত্ন লালন। সত্যকারের সমবেদনার প্রকাশ হবে সেটাই। তার বদলে আরও একটা বাড়তি খুন, তাতে কারও হিত নেই। জীবন পবিত্র। যা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না তা কেড়ে নেওয়ার অধিকারই বা কে আমাদের দিল? মৃত্যুদণ্ড মানে সংশোধনের সব সুযোগ মুছে দেওয়া। মানুষকে নতুন-মানুষে পরিণত করার মানবিক কর্তব্যটি ভুলে যাওয়া। উচ্ছেদকারীরা ব্রিটেনের খুন্টি বা ভারতের শঙ্করিয়াকেও মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারা-দণ্ড দেওয়ার পক্ষপাতী। তাদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সংশোধনের অযোগ্য যে খুনী তার পক্ষে যাবজ্জীবন বলতে অবশ্য দশ পাঁচ বছর বোঝাবে না, বোঝাবে আমরণ কারাবাস। যাকে বলে 'ডাবল লাইফ' কিংবা লাইফ প্লাস নাইনটিনাইন ইয়ার্স? হয়তো এতে রাজকোষের কিছু বাড়তি খরচ হবে, কিন্তু জীবন নাশ করে চরম মূল্য গুনে দেওয়ার চেয়ে সে-খরচ তুলনায় নিশ্চয়ই কম। এসব ব্যাপারে জন-মতের দোহাই পাড়া, প্রতিবাদীরা বলেন,—এক ধরনের চালাকি। জনমত তো ইনকাম ট্যাক্সেরও বিরুদ্ধে। সরকার কি সে মত মেনে চলছেন? সুতরাং, তথা-কথিত জনমতের অজুহাত না-দেখিয়ে সরকারের কর্তব্য ফাঁসির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। তাদের স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে বলা এতকাল তোমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলে। ছিলাম আমরাও। আইন-প্রণেতারা, পুলিস ওরফে আরক্ষা বিভাগের কর্মীরা, দণ্ডদাতা বিচারকরা, তাঁদের আজ্ঞাবাহক কারাধ্যক্ষ এবং জল্লাদরা—কুসংস্কারে অন্ধ ছিলাম আমরা সবাই। আমাদের সকলেরই একবার পিছু ফেরা দরকার। সেই কবে থেকে ফ্যানসি লেন ধরে হেঁটে চলেছে সভ্যতা। এখনও কি বোঝা যাচ্ছে না—এই অন্ধকার গলি অন্তহীন, তার শেষ নেই!

যাবজ্জীবন কারাবাস, সেও তো কম যন্ত্রণাদায়ক নয়—সওয়াল করেন কেউ কেউ। বিলম্বিত বিচার-পদ্ধতি যেমন অসহনীয়, তেমনই কি অসহনীয় নয় দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড? বছরের পর বছর এভাবে তিলে তিলে মারার চেয়ে এ-ভাবে জীবনে হঠাৎ ছেদ টেনে দেওয়া, সে কি আরও মানবিক নয়? এঁরা ভুলে যান পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে কারাগার বলতে এখন আর সেই পূতিগন্ধময় উকুন আর ছারপোকায় আকীর্ণ হিম-শীতল অন্ধকার কতকগুলি কুঠরি নয়, জীবন সেখানে অতীতের তুলনায় অনেকটা সহনীয়। কারাগারের জীবন অবশ্যই সহজ স্বাভাবিক মুক্ত সামাজিক জীবনের বিকল্প নয়, কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে লোভনীয় নিশ্চয়। এক ঘণ্টা...দশ মিনিট... আধ মিনিট। মনে পড়ছে ডস্টয়ভস্কির 'ইডিয়ট'-এর কথা। ...তার পরই সব শেষ। দণ্ডিত আসামীর পক্ষে আরও অসহ্য যে চিন্তাটি সেটি হচ্ছে এই মৃত্যুর অমোঘতা। খুনী বা ডাকাতের হাতে পড়লে মানুষ ভাবতে পারে হয়তো বেঁচে যাবে, হয়তো এরা মত পালটাবে, হয়তো শেষ মুহূর্তে পালাবার কোনও সুযোগ এসে যাবে,

কিন্তু এখানে সে-সব চিন্তা অবান্তর। আসামী জানে তার রেহাই নেই। ডস্টয়-ভস্কি মনে করেন—এ মৃত্যু আরও ভয়াবহ সে-কারণেই তিনি লিখেছিলেন—কোনও দণ্ডিত আসামীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এই মৃত্যুর বদলে সারাজীবন একাকী একখণ্ড পাথরে বসে থাকতে তুমি রাজী? সে তবে বেছে নেবে দ্বিতীয়টাই!

মৃত্যু-কুঠরির ঘুলঘুলি দিয়ে আশার ক্ষীণ আলোর রেখা যখন উঁকি দেয় তখনও কিন্তু অন্য ধরনের যন্ত্রণা। কেরিল চেসম্যানের কাহিনী সবাই জানেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও জেলখানায় বসে মৃত্যুর সঙ্গে সে পাঞ্জা লড়ে গিয়েছিল দীর্ঘ বারো বছর। তার মুক্তির জন্য কালিফোর্নিয়ার গভর্ণরের দপ্তরে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার আবেদন-পত্র এসে আছড়ে পড়ত। তবু দণ্ড বহাল। ১৯৬০ সনের ২ মে গ্যাসচেম্বারে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাকে। মৃত্যুর আগে বিশ্ব-মানুষের কাছে তার জিজ্ঞাসা ছিল—রাষ্ট্র তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু তোমরা কী পেলে? শেষ দিনটি আসার আগে চেসম্যানের জন্য একবার দুবার নয়, আটবার ঠিক হয়ে যায় শেষ দিন। তারপর সব প্রস্তুতি যখন শেষ তখন নয়া-হুকুম—আপাতত স্থগিত! অষ্টমবারে সে-নির্দেশ এসেছিল চেস-ম্যানকে গ্যাসচেম্বারে ঢোকাবার মাত্র দশ মিনিট আগে। ভাবা যায়? আমাদের দেশে তুলনীয় ঘটনা বোধহয় ভুসাইয়া আর কিস্ট গোঁদ-এর ফাঁসি। এদের ফাঁসির হুকুম হয় ১৯৭২ সনের জানুয়ারিতে। ফাঁসি বন্ধ রাখা হয় দুই দুইবার। একবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। ওঁরা নিজেদের চোখ ব্লাডব্যাংকে দান করেছিলেন। সুতরাং, ফাঁসিমঞ্চের এক ধারে চোখের ডাক্তাররাও পর্যন্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে। এমন সময় আদালতের নির্দেশ—আজ মুল-তবি রইল।

দণ্ডিতদের মনের খবর কে জানে!

শেষ প্রশ্ন—যাদের আমরা ফাঁসি দিয়েছি তারা কি সবাই অপরাধী ছিল? আইনের চোখে সবাই কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত খুনী? আমরা সদ্য-বিগত অরণ্য পর্বে ঘটিবাটি চুরির অপরাধে যাদের ফাঁসি হয়েছে তাদের কথা বাদ-ই দিচ্ছি। শুধু পরবর্তীকালের খুনীদের কথাই বলছি। খুনী হিসাবে যাদের ফাঁসি-কাঠে ঝোলানো হয়েছে সবাই কি তারা প্রশ্নাতীত ভাবে খুনী ছিল? বিচারে ভুল ভ্রান্তির কোনও সম্ভাবনাই কি ছিল না কখনও? দণ্ডিতরা যা বুঝে পেয়েছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সে-ই কি তাদের ন্যায্য প্রাপ্য?

অবশ্যই নয়। সবাই জানেন নন্দকুমারের ফাঁসিকে কিছু কিছু ইংরাজও আখ্যা দিয়েছেন—'জুডিসিয়্যাল মার্ডার'। ইতিহাস বলে এ-ধরনের আরও অনেক খুনই হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে। হয়তো এখনও হয়। সে-সম্ভাবনা বোধহয় কখনও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ক'বছর আগে পশ্চিম জার্মানীর বিচার-বিভাগ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন—১৮৫৩ থেকে ১৯৫৩ এই একশ বছরে সাতাশজন এমন মানুষকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে যারা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। সরকারী বিচার বিভাগের গবেষকরাই প্রমাণ করেছেন বিচার বিভ্রাট ঘটে গেছে। ১৮৬৪ সনে ব্রিটিশ রয়াল সোসাইটির কাছে একজন বিশিষ্ট রাজকীয় সাক্ষী বলেন গত চল্লিশ বছরে অমরা ভুলক্রমে ২২ জন নিরপরাধীকে ফাঁসি দিয়ে ফেলেছি। ১৯৬১ সনে লেসলি হেলে নামে একজন গবেষক একটি বই প্রকাশ করেন। নাম—'হ্যাংগড ইন এরার।' তাতে তিনি দেখিয়েছেন ব্রিটেনে অন্তত ছয়জন এমন মানুষকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছে যারা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। আরও পাঁচটি মামলায় একই ভুল ঘটতে যাচ্ছিল, দৈবাৎ আসামীরা প্রাণে বেঁচে যায়। তাদের বাঁচবার কৃতিত্ব মাননীয় বিচারকদের নয়, অন্যদের।

হেলে-বর্ণিত প্রতিটি কাহিনীই শোনার মতো। এখানে তার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে দু'চারটির উল্লেখ করছি। ১৮২৯ঃ ড্যানিয়েল লিরির ফাঁসি হয়। সে তার সঙ্গীকে নাকি বিষ দিয়েছিল। পরে প্রমাণ হয় লোকটির হার্ট ফেল করেছিল। অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু। ১৮৭৯ঃ পুলিস হত্যার দায়ে ফাঁসি হয়ে যায় জন হ্যাবন নামে একজনের। তিন বছর পরে চার্লস পীস নামে আর একজন স্বীকার করে আসল হত্যাকারী সে, হ্যাবর্ন নির্দোষ। ১৯১৩ঃ একজন হাঙ্গেরিয়ানের হত্যাকারী হিসাবে একজন ইংরাজের ফাঁসি হয়ে যায়। পরে প্রমাণ মেলে লোকটি আত্মহত্যা করেছিল।

বলা যেতে পারে এসব পুরনো দিনের ব্যাপার। আদালতে তখন আলো-আঁধারি পরিমণ্ডল। আইনের বই-ই তখন হয়তো সব নয়। বিচারকদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, মেজাজ মর্জি, জুরীদের ভাবভঙ্গী, পুলিসের কারিগরি—অনেক কিছুই হয়তো তখন ভুলত্রুটির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলত। এখন কি আর সে-ধরনের অনাচার কিংবা উদাসীনতা সম্ভব? আবার উলটে যান হেলে'র বইখানার পাতা। ১৯৪৭ঃ একজন বারবনিতাকে হাতুড়ি দিয়ে খুন করার অপরাধে ফাঁসি হয়ে গেল গ্রাহাম রাউল্যাণ্ড নামে একটি লোকের। হাতুড়ি-বিক্রেতা, পানশালার মালিক, পথচারী সবাই একবাক্যে বললেন, হ্যাঁ, এই সেই লোক। রাউল্যাণ্ড নিজেও উলটা পালটা বলে গোল বাধাল। ফলে ফাঁসি। দিন যায়। হঠাৎ ডেভিড জন নামে একটি লোক বলতে শুরু করল ওই রমণীর হত্যাকারী রাউল্যাণ্ড নয়, সে। তার কাহিনী অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। পুলিস তবু বলছে—সব বানিয়ে বলা। সুতরাং, মামলা নতুন করে তোলার প্রশ্ন ওঠে না। তার কিছুদিন পরে জন কিন্তু সত্য সত্যই জড়িয়ে পড়ে আর একটি খুনের মামলায়। তখন বোঝা যায়, আগের ঘটনাটিও সত্য। এই লোকটিই খুনী বটে। তবে ওর মাথার ঠিক নেই।

১৯৫৩ সনে, বিখ্যাত খৃস্টির মামলা। নিজের স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে ইভানস নামে একজনের ফাঁসি হয়। ইভানস নিজেও কবুল করে তার অপরাধের

One of the 1st Death warrant and in Calcutta.

(91)

Fort William in Bengal

George the Third by the Grace of God of Great Britain France and Ireland King Defender of the faith and so forth To the Sheriff of the Town of Calcutta and Factory of Fort William in the Province of Bengal Greeting, whereas at the first Session of Oyer and Terminer and general Goal Delivery for the Town of Calcutta and Factory of Fort William in the Province of Bengal and the Factories thereunto subordinate, holden at the Town of Calcutta aforesaid in the year of our Lord Christ one thousand seven hundred and ninety nine before our Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, Mary Antony and Ramdial Ghose received Sentence of Death for the respective Murders in their several Indictments mentioned Now therefore we require and by these presents strictly command you that you cause Execution of the said Sentences to be made and done upon them the said Mary Antony and Ramdial Ghose on Monday next the seventeenth day of June Instant at the usual place of Execution; Witness Sir John Anstruther Baronet chief Justice at Fort William aforesaid the fifteenth day of June in the year of our Lord one thousand seven hundred and ninety nine and in the thirty ninth year of our Reign.

H. Taylor Sealer

Recd. 15th June 1799
Sheriff's Office

R. Uredale
Clerk of the Crown

কথা। পরে অবশ্য বলেছিল—খৃস্টি ডান ইট! কিন্তু কে কার কথা শোনে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জানা যায়, হত্যাকারী আসলে কুখ্যাত খুনী খৃস্টি। ইভানস মানসিক কারণ বশত তাকে আড়াল করতে চেয়েছিল। খৃস্টি শুধু মিসেস ইভানসকে নয়, আরও কয়টি স্ত্রীলোককে হত্যা করেছে নিষ্ঠুরভাবে। খৃস্টি নিজেই আদালতকে শুনিয়েছিল মিসেস ইভানসকে হত্যার বীভৎস বিবরণ! অথচ পুলিস আর বিচারকরা সাড়ে তিন বছর আগে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে আছেন বেচারা ইভানসকে।

এমনই আরও অনেক ঘটনাই হয়তো চাপা পড়ে রয়েছে পুলিসের খাতা আর আদালতের রায়ের আড়ালে, কে তার খবর রাখে। আমরা দায় দায়িত্ব মাননীয় বিচারকদের অর্পণ করেই দিব্যি নিশ্চিন্ত। অথচ ভারতেরই ঘটনা—পাঁচ জন চা বাগানের শ্রমিকের ফাঁসি হয় মালিক হত্যার অপরাধে। পরে দেখা যায় মালিক মহোদয় বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। এই খুনের খেসারত দেবেন কে? দিলেও কীই বা আর দেবেন? জীবন তো আর ফিরে পাবে না ওরা! ভারতেরই লোক-সভায় কিছুকাল আগে শোনা গিয়েছিল আর একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা—মৃত নাকি খুনীদের বিচার দেখতে হাজির ছিল আদালতে। অন্ধ্রের এক আদালতে খুনের দায়ে আটজন 'আসামী'র বিচার চলছে। পুলিস ইনিয়ে বিনিয়ে পেশ করেছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। বিচারক প্রায় নিশ্চিত। এমন সময় শোনা গেল দর্শকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষটি যার খুনের বিচার চলছে আদালতে।

তা-ই বলছিলাম—সবই হয়। সব ফাঁসি নির্ভুল নয়। কে জানে, মারি অ্যানি আর রামদয়াল ঘোষের অপরাধও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল কিনা! আমার সামনে পড়ে রয়েছে একখণ্ড কাগজ। একটি ডেথ-ওয়ারেণ্ট। তারিখ—কলকাতা, ১৫ জুন, ১৭৯৯। এই কাগজখানা হাতে নিয়েই একদিন জল্লাদ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওদের সামনে। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। কী তাদের অপরাধ? নরহত্যা। আমি ভেবে পাচ্ছি না একজন বিদেশিনী আর এক বাঙালী মিলে কাকে হত্যা করেছিল, কেনই বা। আমার কাছে তার চেয়েও রহস্যময় ঠেকছে আর একটি ব্যাপার, অন্যরা যখন খুন করে একটাকা জরিমানা গুনে দিয়েই খালাস পেয়ে যাচ্ছে তখন এদের কেন ফাঁসি হল? —ওরা তো আর চুরি করেনি! আমি আবার খুঁটিয়ে পড়ে দেখলাম ওয়ারেণ্টে জাল বা জুয়াচুরিরও উল্লেখ নেই। তবে? আচ্ছা, ওরা কি কোনও উকিল নিয়োগ করতে পেরেছিল? কে জানে। কেননা, আইনের পরামর্শ কলকাতায় তখন খুবই মহার্ঘ। সুপ্রিম কোর্টের কোনও অ্যাটর্নিকে একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে হলে নজরানা লাগে এক গোল্ড মোহর। যত প্রশ্ন তত গোল্ড মোহর। কোঁচড়ে তাই যদি থাকবে তবে কেন পঁচিশ টাকা দামের ঘড়ি চুরি করতে যাবে বেচারা ব্রজকিশোর। আর কেনই বা স্রেফ 'খুনের দায়ে' অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় ফাঁসি হবে এদের!